উসমানি খেলাফতের স্বর্ণকণিকা

আইনুল হক কাসিমী

Scanned by CamScanner

উসমানি খেলাফতের

স্বর্ণকণিকা

আইনুল হক কাসিমী

কালান্তর প্রকাশনী

Scanned by CamScanner

প্রকাশকাল
একুশে বইমেলা ২০১৮

© প্রকাশক

প্রচ্ছদ : ইনাম বিন সিদ্দিক

প্রকাশক
আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট
+88 01711 984821

পরিবেশক
রকমারি ডটকম
www.rokomari.com/kalantorprokasoni
Phone : 16297

প্রাপ্তিস্থান
মাকতাবাতুল আযহার
১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
+88 01715 023118

মাকতাবাতুল আযহার
সিলেট শাখা
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট, বাংলাদেশ
+88 01753 762880

BD ৳ 260, US $ 11, UK £ 7

মুদ্রণ
বোখারা মিডিয়া
+88 01712 905128

ISBN: 978 984 90473 3 9

Osmai Khelafoter Sornokonika
by **Ainul Haque Qasimi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Scanned by CamScanner

উৎসর্গ

আমার পীড়িত আব্বা–সুন্দর এ বসুন্ধরায় যিনি
আমার জন্য আল্লাহর রহমতের ছায়া।
রাতের শেষপ্রহরে, জায়নামাজে বসে যাঁর
গাল বেয়ে পড়া দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু
আমার জীবনপথের পাথেয়।

Scanned by CamScanner

প্রকাশকের কথা

উসমানি খেলাফত। প্রতাপশালী, দীর্ঘমেয়াদী ও বৃহৎ ইসলামি শাসনব্যবস্থা। বঞ্চিত ও নিগৃহীত মুসলিম উম্মাহর হারানো খেলাফত। শৌর্য-বীর্য, শক্তি-সাহস, ক্ষমতা আর দাপটের ইতিহাস। ছয় শতাব্দীর স্বর্ণালি, গৌরব ও কীর্তিগাঁথা অধ্যায়।

১২৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৬২৫ বছর এ খেলাফত মুসলিম বিশ্বকে শাসন করে। কিন্তু একপর্যায়ে পশ্চিমাদের নেমকখোর 'মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক পাশা'র হাতেই দাফন হয় এ খেলাফত ব্যবস্থার।

দুনিয়া কাঁপানো এ বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য তখন থেকেই অপবাদ, অপপ্রচার আর চরম বিকৃতির শিকার। ইসলাম বিদ্বেষী পশ্চিমা ঐতিহাসিক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, লেখক, নাটক-মুভি নির্মাতা আর বিশ্লেষকদের বিষাক্ত দাঁতের কামড় এখনও লেগে আছে এই সাম্রাজ্যের গায়ে! তারা সোনালি এ সাম্রাজ্যের সুলতান আর খলিফাদেরকে বিলাসপ্রিয়, নারীলোভী, মদ্যপ, রক্তখেকো, যুদ্ধবাজ আর বর্বর শাসক হিসেবে চিত্রিত করেছে এখনও করছে!

তাদের এসব মিথ্যার আবরণ সরিয়ে সত্যকে উন্মোচিত করতে কলম ধরেছেন অনুজ আইনুল হক কাসিমী। নিজের ফেইসবুক পাতায় 'উসমানি খেলাফতের স্বর্ণকণিকা' নামে ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকেন। সিরিজটি ফেইসবুকের শুভ্র-নীলের আঙিনায় বেশ সাড়া ফেলে। পাঠক-পাঠিকাদের উচ্ছ্বাস আর আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করে সিরিজটিকে মলাটবদ্ধ আকারে 'কালান্তর' থেকে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

কালান্তর প্রকাশনীর মিশনই হলো, মুসলিম উম্মাহর স্বর্ণালি ইতিহাস, চিরস্মরণীয় মুসলিম লড়াকু সৈনিকদের সঠিক তথ্যসম্বলিত জীবনী, ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা বিকাশধর্মী মৌলিক ও অনুবাদগ্রন্থ বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেয়া। এ লক্ষ্যেই আমরা কালান্তর প্রকাশনী থেকে ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সিপাহসালার আল্লামা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানির "রেশমি রুমাল আন্দোলন" ঐতিহাসিক 'আইন জালুত'-এর যুদ্ধে হিংস্র-বর্বর তাতারিদের উন্মত্ত তরবারিকে ভেঙে দেয়া 'মামলুক সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স'র জীবনী "দ্য প্যান্থার" উসমানি

Scanned by CamScanner

খেলাফতের সবচেয়ে প্রতাপশালী সুলতান সুলায়মানের নৌসেনাপতি 'খাইরুদ্দিন বারবারুসা'র জীবনীভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস "সমুদ্র ঈগল" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে "সিলেটে বঙ্গবন্ধু" ছাড়াও আরও কিছু ঐতিহাসিক বই প্রকাশ করেছি।

রাসুল সা.'র সিরাত, চার খলিফা ও প্রসিদ্ধ সাহাবায়ে কেরাম, উসমানি সুলতান বা খলিফা, আব্বাসি খেলাফত, সালজুক সাম্রাজ্য, ফাতেমি সাম্রাজ্য, খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য, ভারত উপমহাদেশ, স্পেন, মরোক্কোসহ বিশ্বকাঁপানো আমাদের মহান বীরদের জীবনী একের পর এক আপনাদের প্রিয় 'কালান্তর প্রকাশনী' উপহার দেবে ইনশাআল্লাহ।

বইটির কলেবর বৃদ্ধি না করে সাড়ে নয় ফর্মার মধ্যে সমাপ্ত করা হয়েছে। উসমানি খেলাফতের এরকম আরও কিছু সোনালি কাহিনী, বর্ণিল গল্প আর চমৎকার তথ্যের সমাহার নিয়ে প্রকাশ হবে 'উসমানি খেলাফতের স্বর্ণকণিকা'র দ্বিতীয় সিরিজ।

আল্লাহ লেখকের কলমকে আরও শাণিত করুন। কালের খোঁয়াড়ে হারানো মুসলিম উম্মাহর স্বর্ণোজ্জ্বল, গৌরবময় ও কীর্তিগাঁথা ইতিহাসকে ফুটিয়ে তোলার তাওফিক দান করুন।

এ বইটি প্রকাশে আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার মুরব্বি আবদুর রশীদ তারাপাশী এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সম্পাদিকা বোন। আমি উভয়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

বইটিতে তথ্য বা অন্য কোনো ধরনের ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব।

ভালোবাসা অবিরাম!

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
৫ জানুয়ারি ২০১৮

Scanned by CamScanner

লেখকের কথা

হামদ ও সালাতের পর...

উসমানি খেলাফতের ইতিহাস মজলুম ইতিহাস। পশ্চিমারা উসমানি খেলাফতকে দাফন করেই কেবল ক্ষ্যান্ত হয়নি; মুসলিম উম্মাহর গৌরবের প্রতীক এই উসমানি খেলাফতের প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করতে পশ্চিমা ঐতিহাসিক, লেখক, সাংবাদিকরা এমন কোনো মিথ্যাচার নেই, যার আশ্রয় তারা নেয়নি! তাদের মিথ্যা ও বানোয়াট ইতিহাসের নিচে চাপা পড়ে উসমানি খেলাফতের প্রকৃত সত্য ইতিহাস প্রতিনিয়ত চাপাকান্না করে যাচ্ছে।

যার ফলে আজ উসমানি খেলাফত, উসমানি সুলতান বা খলিফাদের নাম শুনলেই কতগুলো বুনো মানুষ ও কতিপয় যুদ্ধংদেহী, রক্তখেকো, নির্দয়, মানবতাহীন বিলাসপ্রিয় মুসলিম শাসকের প্রতিচ্ছবি আমাদের মস্তিষ্কে ফুটে ওঠে!

উসমানি খেলাফত, খেলাফতের সুলতান বা খলিফাদের চেপে রাখা ইতিহাস ও ভাঁজকরা অধ্যায়কে উন্মোচন করতে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। অন্যথায় উসমানি খেলাফত ও খলিফাদের দ্বীনদারি, সততা, মানবতা, গুণ, চালচলন, তাদের সাম্রাজ্য পরিচালনা, সমরনীতি–ইত্যাদি লিখতে গেলে কয়েক খণ্ডের বিশাল গ্রন্থের প্রয়োজন। আরবিতে এ যাবত এসব বিষয়ে হাজারো গ্রন্থ লেখা হয়ে গেছে। আরবি পড়ুয়া সজাগ দৃষ্টিসম্পন্নরা এ ব্যাপারে সম্যক অবগত।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের লেখাগুলো আমার ফেইসবুকের পাতায় 'উসমানি খেলাফতের স্বর্ণকণিকা' নামে সিরিজ আকারে লিখতে শুরু করেছিলাম। কয়েকটি পর্ব লিখেছিমাত্র। হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল 'কালান্তর প্রকাশনী'র স্বত্বাধিকারী বড়ভাই আবুল কালাম আজাদের সাথে! তিনি সিরিজটি তাড়াতাড়ি শেষ করতে তাড়া দিলেন। কালান্তর প্রকাশনী থেকে সিরিজটি বই আকারে প্রকাশ করবেন বলে অগ্রিম বাগড়া দিয়ে রাখলেন। মূলত তার সেই তাড়া খেয়েই সিরিজটি নিয়মিত ফেইসবুকের পাতায় লিখতে থাকলাম। আলহামদুলিল্লাহ অল্পদিনেই ফেইসবুক বন্ধুদের পক্ষ থেকে ব্যাপক সাড়া পেতে শুরু করলাম। তারা খুবই উচ্ছাসের সাথে সিরিজটি চালিয়ে যেতে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে উৎসাহ

Scanned by CamScanner

প্রদান করলেন। এভাবে লিখতে লিখতে বেশ কয়েকটি পর্ব লিখেছিলাম ফেইসবুকের পাতায়। কিন্তু যখন দেখা গেল, গল্পগুলো কপি হতে চলেছে, তখন প্রকাশক মহোদয়ের পরামর্শে সিরিজটি ফেইসবুকে প্রকাশ করা থেকে বিরত রইলাম।

লিখতে লিখতে বইটির কলেবর বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। তাই নির্ধারিত সীমায় এসে বইটি শেষ করে নিলাম। কিন্তু এ সংক্রান্ত বেশকিছু চমৎকার গল্প বাকি রয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ সেগুলোও পরবর্তীতে 'উসমানি খেলাফতের স্বর্ণকণিকা' সিরিজ-২ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছা আছে।

যথাসম্ভব বইটিকে নির্ভরযোগ্য সূত্র দ্বারা সাজাতে চেষ্টা করেছি। একেকটি লেখার একাধিক সূত্র থাকলেও সবগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করিনি। গুটিকতেক জায়গায় সূত্র হিসেবে আরবি সাইট ও ফেইসবুক পেইজের নাম ব্যবহার করেছি। উল্লেখিত জায়গা থেকে নেয়া কাহিনীগুলোও কিন্তু কোনো না কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে চয়নকৃত। সময়ের অভাবে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করতে পারিনি। তবে পরবর্তী সংস্করণে সূত্র হিসেবে মূল কিতাবের রেফারেন্স দিতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আরেকটি কথা, যেহেতু বইটি উসমানি খেলাফতের ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে লেখা, তাই বইয়ে ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক কোনো ভুল থাকতে পারে। যদি কারও চোখে এরকম কোনো বিভ্রাট পরিলক্ষিত হয়, তাহলে অবগত করিয়ে দেয়ার বিনীত অনুরোধ করছি। আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

সবশেষে 'কালান্তর প্রকাশনী'র স্বত্বাধিকারী বড়ভাই আবুল কালাম আজাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, মুসলিম উম্মাহর গৌরবের প্রতীক এসব অবহেলিত, অনাদরিত ও হারানো স্বর্ণোজ্জল ইতিহাসকে বর্তমান প্রজন্মের সামনে উপস্থাপন করার গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য। দোয়া করি কালান্তর প্রকাশনী উম্মাহর স্বর্ণোজ্জল ইতিহাসকে প্রকাশ করার এ ধারা যেন অব্যাহত রাখে।

আইনুল হক কাসিমী
১ জানুয়ারি ২০১৮
ainulh985@gmail.com

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

ছোট্ট জায়গির থেকে বিশাল সাম্রাজ্য	১৩
ন্যায়নীতি রাজত্বের মূলভিত্তি	১৬
স্বপ্নের সাম্রাজ্য	১৭
মোল্লা নাসিরুদ্দিন হোজ্জার কিছু গল্প	২০
উসমান বিন আরতুগালের বিদায়ী কথা	২৬
ইউরোপ সীমান্তে আশিজন মুজাহিদ	২৮
কালেমা পড়াতে গিয়ে শাহাদতবরণ	৩১
অধিকার ও যোগ্যতা	৩৬
সাক্ষ্য প্রদানের অযোগ্য সুলতান	৩৮
মসজিদের মধ্যখানে ওজুর হাউজ	৩৯
সমুক্তি বাবা	৪১
সুলতান ও ভাঁড়	৪৪
প্রকৃত মুরিদ	৪৮
আমাদের শহরগুলোও শাসন করুন	৫১
আমাদের শহরকে আপনার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করুন	৫২
গোলাম থেকে শায়খুল ইসলাম	৫৫
সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের অসিয়ত	৫৭
আসামির কাঠগড়ায় সুলতান	৫৯
শায়খ আক শামসুদ্দিনের আত্মসম্ভ্রমবোধ	৬১
ডাকাতের থলে ঝুলে বৃক্ষের ডালে	৬২
নরপিশাচ ড্রাকুলার পরিণতি	৬৩
আজব সুড়ঙ্গপথ	৬৬
কনস্টান্টিনোপলের আধ্যাত্মিক বিজয়ী	৬৮
উত্তম সেনাপতি ও তার সেনাদল	৭০
তরবারির অবদান ভুলে গেলে চলবে না	৭২
সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের বদান্যতা	৭৩
সুলতান আলফাতিহ ও সিনান পাশা	৭৬
শায়খের প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধা	৭৮
যে সুলতান কাপড়ের ধুলোবালি শিশিতে ভরে রাখতেন	৮০
যে সুলতানের এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়নি	৮১
সুলতানকে অপসারণের ফাতওয়ার হুমকি	৮২
সুলতান প্রথম সালিমের তাকওয়া	৮৫
হাকিমুল হারামাইন নই; খাদিমুল হারামাইন	৮৭
কাদাযুক্ত কুফতান কফিনে ভরে দেয়ার অসিয়ত	৮৮
নাঙ্গা কৃপাণ	৮৯
খলিফার অবাক করা বিনয়!	৯১

Scanned by CamScanner

সুলতানও খালি হাতে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন ৯৩
ইয়াহুদির কুঁড়েঘরে সুলতান সুলায়মান ৯৫
ফ্রান্সের বন্দি রাজা ও তার মায়ের ফরিয়াদ ৯৭
আঙুর লতায় ঝুলন্ত টাকা! ৯৯
যে মসজিদ নির্মাণের আদেশদাতা রাসুল সা. ১০০
সুলতান সুলায়মানের ইনসাফ ১০১
সুলতানের পথরোধে বৃদ্ধা ১০২
ফ্রান্সকে নৃত্যগান বন্ধের হুঁশিয়ারি ১০৩
পোশাক দেখেই স্প্যানিশ সেনাদলের পলায়ন ১০৪
বাক্সভর্তি ফাতওয়া নিয়ে কবরে ১০৬
শাহজাদি মিহরিমাহ সুলতান ১০৮
দুই আলেমের মনোভাব ১১০
আদালতের বিচারক স্বয়ং রাসুল সা. ১১১
বাবুর্চি হাসান জওলাকের আত্মদান ১১২
নীল মসজিদে ছয়টি মিনারের আসল রহস্য ১১৭
সুলতান চতুর্থ মুরাদের হৃদয়ের অশান্তি ১১৯
ঘুষখোর কর্মকর্তাকে পাকড়াওয়ের কৌশল ১২১
স্বর্ণভর্তি জুতো ১২৩
আমেরিকাও উসমানিদের কর প্রদান করত ১২৪
এক ইঁচড়েপাকা ছেলের গল্প ১২৬
জেনোসারি ও পাগলা দলের অজানা অধ্যায় ১২৭
উসমানিদের অতিথিপরায়ণতা ১২৯
সম্রাজ্ঞীর প্রসব বেদনা ১৩০
মদিনাওয়ালার নামে যার অন্তর উৎসর্গিত ১৩১
লালকার্ড সাদাকার্ড সমাচার ১৩২
যেমন কুকুর তেমন মুগুর ১৩৪
জাদুকরি চশমা আর হারানো ঘড়ি ১৩৫
সুলতান ও সম্রাজ্ঞীরা যখন সেবক ১৩৬
সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ১৩৭
বিয়ে ও লাল-হলুদ ফুল সমাচার ১৩৯
পাথর বা দেয়ালের খাঁজে সদকাহর টাকা ১৪১
গোলাপজল দিয়ে রেলপথকে ধৌত করা ১৪২
এগার বছর বয়সেই বোরখা পরার হুকুম ১৪৩
সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের হুমকি ১৪৪
উসমানিদের বিবাহ আইন ১৪৬
রাসুলের মদিনায় আগে বাল্ব জ্বলবে ১৪৮
যেমন নাকি খেয়ে নিয়েছি মসজিদ ১৪৯

Scanned by CamScanner

ছোট্ট জায়গির থেকে বিশাল সাম্রাজ্য

উসমানিরা ছিল অঘুজ তুর্কি বংশোদ্ভূত। পূর্ব তুর্কিস্তান ছিল তাদের আদি ভূমি। উইঘুর মুসলিম অধ্যুষিত এ ভূখণ্ডটি যুগের পর যুগ ধরে চীনের দখলকৃত একটি প্রদেশ। বিশ্বের মানচিত্রে যা জিনজিয়াং নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে উসমানিরা বসবাস করত কুর্দিস্তানে। বকরি, দুম্বা, ও মেষ পালন করে জীবনযাপন করত। কিন্তু যখন ইরাক ও এশিয়া মাইনরের পূর্বাঞ্চলে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁর রক্তপাত বেড়ে গেল, উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান বিন আরতুগালের দাদা সুলায়মান শাহ তার 'কাই' গোত্রকে নিয়ে ১২২০ খ্রিস্টাব্দে জীবন বাঁচাতে কুর্দিস্থান থেকে হিজরত করে আনাতোলিয়ার দিকে চলে আসেন। এখানে এসে 'আখলাত' নামক অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। ১২৩৮ খ্রিস্টাব্দে সুলায়মান শাহর মৃত্যুর পর কাই গোত্রের সর্দার নিযুক্ত হোন সুলায়মানের মেঝো ছেলে। একই কারণে আরতুগাল তার গোত্রকে নিয়ে ধারাহিকভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম আনাতোলিয়ার দিকে বাড়তেই থাকেন।

একদিন আরতুগাল বিন সুলায়মান শাহ তার গোত্রের একশটি পরিবারের প্রায় চারশ যোদ্ধাকে নিয়ে তাতারিদের উত্তোলিত তরবারি থেকে বাঁচার জন্য ছুটে চলছিলেন। হঠাৎ করেই কোথাও ঢাল-তলোয়ারের ঝনঝনানি আর ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শুনতে পেলেন। একটু কাছে আসতেই দেখতে পেলেন মুসলিম ও খ্রিস্টান দুইদলে রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে! লড়াইয়ে খ্রিস্টানদের পাল্লা ভারি। তাদের হাতে বেদম মার খাচ্ছে মুসলিমরা। মুসলিমদের পরাজয় একেবারে দ্বারপ্রান্তে। ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ, ধর্মীয় আত্মসম্মান আর ঈমানি চেতনা উছলে উঠল আরতুগাল বিন সুলায়মান শাহর তনু-মনে। গোত্রের যোদ্ধাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করার নির্দেশ দিলেন। গোত্রনেতার ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র মুহূর্তের মধ্যেই বাজপাখির মতো ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্ধর্ষ 'কাই' গোত্রের প্রায় চারশ মুসলিম যোদ্ধা। মুসলিম বাহিনীর পতাকাতলে সমবেত হয়ে আঘাত হানল খ্রিস্টান বাহিনীর উপর। অল্পক্ষণের ভেতরেই টনক

Scanned by CamScanner

নড়ে উঠল শত্রুপক্ষের। চোখে শর্ষেফুল দেখতে শুরু করল তারা। অবশেষে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করল।

মুসলিম বাহিনীটি ছিল সালজুকি সালতানাতের আর খ্রিস্টান বাহিনী ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের। নিশ্চিত পরাজয়ের মুখ থেকে বাঁচানোর কারণে আরতুগাল ও তার বাহিনীকে একমাত্র আল্লাহর বিশেষ মদদ হিসেবে ধরে নিলেন মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার সুলতান আলাউদ্দিন সালজুকি। তিনি আরতুগাল ও তার বাহিনীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আরতুগালকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তঘেঁষে পশ্চিম আনাতোলিয়ার কিছু ভূমির জায়গিরদারি দান করলেন। কালের আবর্তে এই জায়গিরটি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠল। আরতুগাল দিনে দিনে বাইজেন্টাইন ভূমি জয় করে তার জায়গিরের সীমানা বর্ধিত করতে থাকলেন। বাইজেন্টাইন রোমকদের প্রতিরোধের জন্য আরতুগালের জায়গির হয়ে উঠল সালজুকি সালতানাতের ডানহাত। এক বিশ্বস্ত বন্ধু। সর্বোপরি সালজুকি সালতানাতের ভূমি আনাতোলিয়ার পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার এক অতন্দ্র প্রহরী।

জীবনভর সালজুকি সালতানাতের অনুগত ছিলেন আরতুগাল। তাদের নির্ভরযোগ্য মিত্র। ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হন তারই সুযোগ্য সন্তান উসমান বিন আরতুগাল। তিনিই হন পশ্চিম আনাতোলিয়ার জায়গিরদার। তাতারিদের হাতে একসময় সালজুকি সালতানাতের পতন হলে তিনি ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা করেন সালতানাতে উসমানিয়াহ বা উসমানি সাম্রাজ্য। ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উসমানি সালতানাত পরিচালনা করেন। ১২৯৯ সালের আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন পিতার মতোই সালজুকি সালতানাতের একান্ত অনুগত একজন জায়গিরদার।

পশ্চিম আনাতোলিয়ার এই ছোট্ট জায়গিরটিই পরবর্তীতে ইতিহাসে 'উসমানি খেলাফত' নাম ধারণ করে। শুধু পশ্চিম আনাতোলিয়া নয়; বরং পুরো আনাতোলিয়া, এশিয়া মাইনর, পূর্ব প্রাচ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা ও উত্তরপূর্ব ইউরোপের চৌত্রিশটি প্রদেশ নিয়ে প্রায় বায়ান্ন লক্ষ বর্গকিলোমিটার জুড়ে ছিল এই খেলাফতের সীমানা। যে সীমানায় আজকের পৃথিবীর মানচিত্রে প্রায় বিয়াল্লিশটি দেশের অবস্থান। যে খেলাফত ছিল ইসলামের তিনটি বৃহৎ খেলাফতের অন্যতম। ছিল ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সামরিক

Scanned by CamScanner

শক্তিধর, দুর্দান্ত ও মহাপ্রতাপধর মুসলিম সাম্রাজ্য। যে সাম্রাজ্যের ভয়ে থরথর করে কাঁপত তখনকার অপরাপর সাম্রাজ্যগুলো। এমনকি স্বয়ং আমেরিকা-রাশিয়া যে সাম্রাজ্যের কাছে নতশিরে কর প্রদান করত! কাল থেকে কালান্তরে বহু ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন ও চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এই খেলাফত টিকেছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুলগ্ন পর্যন্ত। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার, ঘরে-বাইরে শত্রুদের লাগাতার ষড়যন্ত্রের জাঁতাকলে পিষ্ঠ হয়ে শেষের দিকে দুর্বল হয়ে যায়। মুসলমানদের জানের দুশমন, পশ্চিমা কাফেরদের এজেন্ট, ইয়াহুদি বংশোদ্ভূত মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক পাশার হাতে ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ বিলুপ্ত হয়ে যায়! ফলে ছয় শতাধিক বছর ধরে বিশ্বের আকাশে জ্বলন্ত এই দিনমণি ডুবে যায় চিরতরে! পৃথিবী বঞ্চিত হয় ঐশী বিধানে পরিচালিত একটি সুন্দর ও বরকতময় শাসনব্যবস্থা থেকে ইনসাফ ও ইনসানিয়্যাতের মূর্তপ্রতীক কিছু শাসক ও তাদের শাসনের রহমত থেকে।[১]

---

১. আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ আওয়ামিলুন নুহুজ ওয়া আসবাবুস সুকুত-৪৪, ড. আলি মুহাম্মাদ আসসাল্লাবি। *তারিখু সালাতিনি আলে উসমান-১০, আহমদ আল কিরমানি। *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাতিল উসমানিয়্যাহ-১১৫, মুহাম্মাদ ফরিদ বেগ। *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ-২৫, ড. আবদুল লতিফ দাহিশ। *জাওয়ানিবু মুজিআতুন ফি-তারিখিল উসমানিয়্যিনাল আতরাক-৩৬, জিয়াদ আবু গুনাইমাহ। *আল খিলাফাতুল উসমানিয়্যাহ-১২, আবদুল মুনইম আল হাশিমি। *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ মিনান নুশু ইলাল ইনহিদার-১৩, ড. খলিল ইনালজিক। *ইসলামস্টোরি ডটকম। *তুর্কপ্রেস ডটকম।

Scanned by CamScanner

ন্যায়নীতি রাজত্বের মূলভিত্তি

আরতুগাল বিন সুলায়মান শাহ ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে বাইজেন্টাইনদের কাছ থেকে 'কারাহজাহ হাসার' শহর বিজয় করে নেন। বিজয়ের পর তার পুত্র উসমান বিন আরতুগালের উপর সেখানকার শাসনভার ন্যস্ত করেন।

একদিন উসমান বিন আরতুগালের দরবারে পরস্পর বিবাদকারী দুজন লোক আগমন করল। একজন মুসলিম অপরজন বাইজেন্টিয়ান খ্রিস্টান। দরবারে উভয়ে প্রতিপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করে বিচার দাবি করল। উসমান বিন আরতুগাল সাক্ষী-প্রমাণের দ্বারা বুঝতে পারলেন–মুসলিম ব্যক্তিই অপরাধী। খ্রিস্টান লোকটি নিরপরাধ। তাই তিনি খ্রিস্টান লোকটির পক্ষেই ফয়সালা করলেন।

এই ফয়সালা শুনে খ্রিস্টান ব্যক্তি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না! মুসলিমের বিপক্ষে ফয়সালা যাবে–এটা তার চিন্তাজগতের ধারেকাছেও ছিল না। সে মনে করেছিল, খ্রিস্টান বলে উসমান বিন আরতুগাল কখনও তার পক্ষে ফয়সালা দিবেন না; বরং মুসলিম শাসক হিসেবে স্বজনপ্রীতি করবেন। এজন্য সে তার কাছে বিচার চাইতে তেমন আগ্রহীও ছিল না–মুসলিম লোকটিই জোর করে নিয়ে এসেছে।

খ্রিস্টান ব্যক্তি তার আশ্চর্যের ঘোর কাটাতে উসমান বিন আরতুগালকে প্রশ্ন করে বসল, 'আমি বিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও আপনি কেন আমার পক্ষে ফয়সালা করলেন!'

উসমান বিন আরতুগাল জবাব দিলেন, 'আমি কীভাবে তোমার পক্ষে ফয়সালা না করি–আমরা যে আল্লাহর ইবাদত করি, তিনি তো কুরআনুল কারিমে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমার আমানতসমূহ তার প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দিবে এবং যখন তোমরা বিচার করবে, তখন অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"[২]

একথা শুনে খ্রিস্টান লোকটি আর দেরি করল না; সাথে সাথে দৃপ্তকণ্ঠে 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ' পড়ে মুসলমান হয়ে গেল![৩]

---

২. সুরা নিসা, আয়াত-৫৮।

৩. আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ আওয়ামিলুন নুহুজ ওয়া আসবাবুস সুকুত-৪৭, ড. আলি মুহাম্মাদ আসসাল্লাবি। *জাওয়ানিবু মুজিআতুন ফি তারিখিল উসমানিয়িনাল আতরাক-৩২, জিয়াদ আবু গুনাইমাহ। *আল খিলাফাতুল উসমানিইয়্যাহ-১৯, আবদুল মুনইম আল হাশিমি।

Scanned by CamScanner

স্বপ্নের সাম্রাজ্য

১২৮০ খ্রিস্টাব্দ। উসমান বিন আরতুগাল তখন টগবগে যুবক। দেহের শিরা উপশিরায় যৌবনের উচ্ছাস। তখনো বিয়েশাদি করেননি। তখনকার সময়ে একজন প্রসিদ্ধ আলেম ও বুজুর্গ ছিলেন শায়খ 'আদাহবালি'। তিনি উসমান বিন আরতুগালের জায়গিরে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন একজন 'মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ'[৪] আল্লাহর ওলি। লোকেরা তাকে খুবই সম্মান করত। তার কাছ থেকে দোয়া নিতে ভিড় জমাতো। তার কাছ থেকে মাসআলা-মাসায়েল ও ফাতওয়া জিজ্ঞেস করত। তিনি ছিলেন উসমান বিন আরতুগালেরও প্রিয়পাত্র। তার ঘরে উসমান নিয়মিত যাওয়া আসা করতেন। ওয়াজ-নসিহত ও উপদেশ শুনতেন। শায়খের একজন পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন। দেখলে চোখ ফেরানো দায়। নাম তার 'মালখাতুন'।

একদিন হঠাৎ করেই যুবক উসমানের দৃষ্টি পড়ে গেল মালখাতুনের উপর। মালখাতুনের সৌন্দর্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন! আপন শায়খের ঘরেই যে তার এক রূপবতী ললনা আছে, তা তিনি জানতেন না। মালখাতুনের সৌন্দর্যে তিনি এতোটাই অভিভূত হয়ে পড়লেন, এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে-তিনি বুঝতেই পারেননি! সম্বিৎ ফিরে পেতেই তিনি দৃষ্টি সংযত করে নিলেন। দৃষ্টি সংযত করে নিলেন ঠিকই; কিন্তু মালখাতুন তার হৃদয় দখল করে নিলেন। একেতো একজন বুজুর্গের কন্যা; তার উপর সুন্দরী। তাই উসমান মালখাতুনকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। কিন্তু শায়খকে বলবেন কীভাবে-তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন। যাক, তবুও একবার সাহস করে বলেই ফেললেন-

-আফেন্দি! একটা কথা বলতে চাইছিলাম...

-কী, বলো?

-না, মানে...

-না মানে কী? নিঃসংকোচে বলতে পারো!

-আপনার সাহেবজাদিকে বিয়ে করতে চাইছিলাম...

-না!

-আফেন্দি! যদি আজ্ঞা হয় আপনার, তাহলে আমি মনে করি আমার দুনিয়া আখিরাতে মঙ্গল হবে...

৪. এমন আল্লাহর ওলি, যার দোয়া কবুল হয়।

Scanned by CamScanner

-না!

কী আর করা, যুবক উসমান ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এলেন।

'শায়খ আদাহবালি' প্রথমে বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু উসমান বিন আরতুগাল তো নাছোড় বান্দা। শায়খের দরবারে বারবার এ আরজি নিয়ে হাজিরা দিচ্ছেন আর শায়খ তার নেতিবাচক সিদ্ধান্তের উপর উপত্যকার জগদ্দল পাথরের মতো জমে আছেন।

একদিন উসমান বিন আরতুগাল শায়খের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেন এবং ঘুম থেকে জেগে শায়খকে বললেন,

-আফেন্দি! আমি এখন একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি!

-কী স্বপ্ন?

-আমি দেখলাম, আপনার বুক থেকে একটি সূর্য বের হয়ে আমার বুকে এসে পড়ল। এরপর সূর্যটি আমার মেরুদণ্ড থেকে একটি বৃক্ষের অঙ্কুর হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। অঙ্কুরটি তৎক্ষণাৎ বড় হয়ে ডালপালা আর পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে গেল। একটি বিরাট বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়ে পুরো দুনিয়া ছেয়ে নিল। দুনিয়া ছড়ানো এ বৃক্ষের ডালপালার নিচে গগনচুম্বী পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়ের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে কতগুলো নদী। লোকজন এসে এই বৃক্ষের ছায়া গ্রহণ করতঃ তার ফল আহরণ করল। তারা নিজেদের এবং তাদের পশু ও বাগানের জন্য নদী থেকে পানি সংগ্রহ করল। আর বৃক্ষের ডালগুলো ছিল দেখতে তলোয়ারের মতো।

উসমান বিন আরতুগালের স্বপ্ন শুনে শায়খ আদাহবালি আশ্চর্য হয়ে গেলেন! তিনি একবার গভীরভাবে পর্যক্ষণ করে নিলেন উসমান বিন আরতুগালের আপাদমস্তক। তিনি বুঝতে পারলেন, এ উসমান কোনো সাধারণ পুরুষ নন; এক অসাধারণ পুরুষ। অচিরেই উসমান এক মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হবেন। তিনি আনন্দ প্রকাশ করতঃ বললেন,

-মাশাআল্লাহ! খুব সুন্দর স্বপ্ন! অচিরেই তুমি এক মহান সুলতান হবে। তোমার একটি বিশাল সাম্রাজ্য হবে। তোমার ও তোমার বংশধর শাসকদের দ্বারা মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হবে। এবার আমি আমার কন্যা 'মালখাতুন'-কে তোমার সাথে বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

Scanned by CamScanner

পরক্ষণেই শায়খ আদাহবালি বিয়ে পড়িয়ে তার কন্যাকে উসমানের হাতে দিয়ে দিলেন। সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে পেয়ে গেলেন উসমান তার মনময়ূরীকে। মালখাতুনকে নিয়ে সাজিয়ে তুললেন তার সুখের সংসার। দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন। একদিন মালখাতুনের কোলজুড়ে আগমন করল এক ফুটফুটে শিশু। উসমান সন্তানের নাম রাখলেন 'উরখান বিন উসমান'। উসমানি সালতানাতের দ্বিতীয় সুলতান।

হ্যাঁ, পরবর্তীতে এই স্বপ্নটি বাস্তবে রূপলাভ করেছিল। উসমান বিন আরতুগালের বংশধর উসমানি সুলতান বা খলিফাগণ গোটা পৃথিবী শাসন করেছিলেন একাধারে ছয় শতাধিক বছর। ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুসলিম বিশ্বের। উসমান বিন আরতুগালের দিকেই সম্বন্ধ করে বলা হয় 'উসমানি খেলাফত-অটোমান সাম্রাজ্য বা উসমানি সাম্রাজ্য'।[৫]

---

৫. আশ শাকাইকুন নুমানিয়্যাহ ফি উলামাইদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ-৬, আল্লামা তাশ কুবরা জাদাহ। *তারিখু দাওলাতিল আলিয়্যাতিল উসমানিয়্যাহ-১১৫, মুহাম্মাদ ফরিদ বেগ।

Scanned by CamScanner

মোল্লা নাসিরুদ্দিন হোজ্জার কিছু গল্প

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা। পূর্ণ নাম 'মোল্লা নাসিরুদ্দিন মাহমুদ আল কাগ্নি'। কে না চেনে তাকে? উসমানি যুগের একজন নামকরা রসিক ব্যক্তি। তার রসিকতার কাহিনী শুধু তুরস্ক নয়; আরব ও আজমে এমনকি গ্রিক, ইটালির সাহিত্যেও পাওয়া যায়। যুগের পর যুগ ধরে আজও তিনি এক ঐতিহাসিক বিনোদনধর্মী ব্যক্তিত্ব। তিনি উসমানি সভ্যতার এক অমর মনীষা। পারস্যবাসীরা তাকে 'মোল্লা নাসরুদ্দিন' বলে চেনে। আরবরা তাকে 'নাসিরুদ্দিন জাহা' বলে ডাকে। ইটালিয়ানরা বিশেষ করে সাইপ্রাসবাসীরা তাকে 'নাসিরুদ্দিন জিউভা' বলে জানে। আজও তুরস্কের 'আকশাহির' শহরে প্রতিবছর পাঁচ থেকে দশ জুলাই 'মোল্লা নাসিরুদ্দিন হোজ্জা উৎসব' পালন করা হয়ে থাকে। ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো তাকে 'আন্তর্জাতিক নাসিরুদ্দিন হোজ্জা' বলে ঘোষণা করে।

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা সালজুকি শাসনামলে তুর্কি 'কুনিহ' প্রদেশের অন্তর্গত আকশাহির শহরে ১২০৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রায় পুরো জীবনই সালজুকি শাসনামলে অতিবাহিত হয়। জীবনের শেষ ক'বছর উসমানি সালতানাতের প্রথমদিকের আমির আরতুগাল বেগ ও সুলতান উসমান বিন আরতুগালের শাসনামলকে পান। ১২৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রসিদ্ধ তুর্কি পর্যটক আউলিয়া চলপি বলেন, নাসিরুদ্দিন হোজ্জা একজন দ্বীনদার, প্রজ্ঞাবান ও মুত্তাকি ব্যক্তি ছিলেন। উসমানি সালতানাতের শুরুলগ্নে তিনি তার মেধা-বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দর্শন, তাকওয়া ও উপস্থিত জবাব দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

হোজ্জা ছিলেন একজন বেঁটে মানুষ। মাথায় পাগড়ি আর গায়ে জোব্বা পরে একটা গাধার ওপর চড়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। হোজ্জাকে নিয়ে হাজারেরও বেশি গল্প পাওয়া যায়। যা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে আজও অলঙ্কৃত। কোনো কোনো গল্পে তাকে খুবই বুদ্ধিমান একজন মানুষ মনে হয়। আবার কোনো কোনো গল্পে তার আচরণ একেবারেই বোকার মতো মনে হয়। তবে তিনি সারাবিশ্বে পরিচিতি পেয়েছেন তার রসবোধের কারণে। তার কথাবার্তা মানুষদের যেমন হাসায়, তেমনি ভাবায়ও। এখানে তার প্রসিদ্ধ কতগুলো রসগল্প উল্লেখ করছি।

Scanned by CamScanner

হুমম, তোমার কথাই ঠিক!

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা তখন কাজি। বিচার আচার করেন। একদিন বিচারে বসেছেন। বাদী মামলার আসামির সম্পর্কে যেসব অভিযোগ করছেন, হোজ্জা তা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। বাদীর বলা শেষ হলে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন,

-'হুমম, তোমার কথাই ঠিক।'

এ কথা শুনে আসামি বলে উঠল,

-'হুজুর, আমার কিছু কথা ছিল।' হোজ্জা বললেন,

-'ঠিকাছে, বলো তুমি কী বলতে চাও?'

আসামির কথাও মনোযোগ দিয়ে শোনার পর হোজ্জা বললেন,

-'হুমম, তোমার কথাও ঠিক।'

হোজ্জার স্ত্রী পর্দার আড়ালে এতক্ষণ সব কথা শুনছিলেন। বিরক্ত হয়ে স্বামীকে তিনি বললেন,

-'দুইজনের কথাই ঠিক হয় কীভাবে? হয় আসামির কথা ঠিক, না হয় বাদীর কথা ঠিক।'

হোজ্জা স্ত্রীর দিকে ফিরে হাসি দিয়ে বললেন,

-'হুমম, তোমার কথাই ঠিক!'

আমি বাজিতে জিতে গেছি!

একবার নাসিরুদ্দিন হোজ্জা অসুস্থ হয়ে গাধাটাকে খাবার দেওয়ার জন্য স্ত্রীকে বললেন। স্ত্রী গাধাকে খাবার দিতে অস্বীকার করলেন। দুজনের মধ্যে এ নিয়ে তুমুল ঝগড়া শুরু হল। ঝগড়া শেষে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, দুজনের মধ্যে যে আগে কথা বলবে সে-ই গাধাকে খাবার খাওয়াবে।

বাজিতে জেতার আশায় তারা কেউ কারো সাথে কথা বললেন না। ওই দিনই বিকেলে হোজ্জার স্ত্রী বাইরে গেলেন। এ সময় ঘরে চোর ঢুকল। হোজ্জা ঘরেই ছিলেন; কিন্তু বাজিতে হেরে যাওয়ার ভয়ে তিনি চোরকে কিছু বললেন না। চোর নির্বিঘ্নে ঘরের সবকিছু নিয়ে চলে গেল। হোজ্জার স্ত্রী বাসায় ফিরে এসে দেখলেন সবকিছু খালি। তখন চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, 'হায় আল্লাহ! এ-কী হলো? ঘরে চোর ঢুকেছিল নাকি?'

হোজ্জা স্ত্রীর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে খুশিতে লাফিয়ে উঠলেন। চিৎকার দিয়ে বললেন, 'আমি বাজিতে জিতে গেছি! এখন গাধাকে খাওয়ানোর দায়িত্ব তোমাকেই পালন করতে হবে।'

Scanned by CamScanner

প্রস্তুত প্রণালী তো আমার কাছে

একদিন হোজ্জা বাজার থেকে গরুর কলিজা কিনে বাসায় যাচ্ছিলেন। দোকানদার একটা কাগজে তাকে কলিজা ভুনা করার পদ্ধতি লিখে দিয়েছিল—যাতে বাসায় গিয়ে রান্না করতে পারেন। হঠাৎ একটি বাজপাখি উড়ে এসে কলিজার ব্যাগটা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

এসময় হোজ্জা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'আরে বোকা! কলিজা নিয়ে গেলে কী হবে? প্রস্তুত প্রণালী তো আমার কাছে!'

কে মারা গেছে-তুমি না, তোমার ভাই?

হোজ্জার গ্রামে যমজ দুটি ভাই ছিল। একদিন শোনা গেল, ওই যমজ ভাইদের একজন মারা গেছে। রাস্তায় ওই যমজদের একজনকে দেখে হোজ্জা দৌড়ে গেলেন তার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে মারা গেছে-তুমি নাকি তোমার ভাই?'

বেড়ালটা গেল কোথায়?

মোল্লা নাসিরউদ্দিন হোজ্জা একবার বাজার থেকে খাসির গোশত কিনে আনলেন। স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন, 'অনেকদিন হয় গোশত খাই না। ভালো করে রাঁধো, যেন খেয়ে মজা পাই।'

হোজ্জার স্ত্রীও অনেকদিন গোশত খাননি। তাই রান্নার পর একটু একটু করে খেতে খেতে সবটা গোশতই খেয়ে ফেললেন! মোল্লা খেতে বসলে তার স্ত্রী কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'আজ আর আপনার বরাতে গোশত নেই; সব গোশত বিড়াল খেয়ে ফেলেছে'।

হোজ্জা অবাক হয়ে বললেন, 'পুরো এক সের গোশতই বিড়াল খেয়ে ফেলল'?

স্ত্রী বললেন, 'তাহলে আমি কী বলছি'?

স্ত্রীর কথা মোটেই বিশ্বাস করলেন না হোজ্জা। তখনই বিড়ালটাকে ধরে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে দেখলেন বিড়ালের ওজন ঠিক এক সের।

হোজ্জা বললেন, 'এটাই যদি সেই বিড়াল হয়, তাহলে গোশত কোথায়? আর এটা যদি গোশতের ওজন হয়, তাহলে বিড়ালটা গেল কোথায়'?

আলখাল্লার পরিবর্তে জোব্বা

একদিন মোল্লা নাসিরুদ্দিন হোজ্জা জুব্বা কিনতে একটি দোকানে গেলেন। তো পছন্দ করার পর দোকানদার জুব্বাটা প্যাকেট করে দিল। হোজ্জা জুব্বা নিয়ে

Scanned by CamScanner

চলে আসার সময় ভাবলেন, জুব্বা না নিয়ে বরং একটি আলখাল্লা নিয়ে যাই। দোকানদারকে বললেন, 'আপনি বরং আমাকে একটি আলখাল্লা দেন।' দোকানদার আলখাল্লা দেয়ার পর হোজ্জা তা নিয়ে বের হয়ে আসার সময় দোকানদার ডেকে বলল,

-হোজ্জা সাহেব! আপনিতো আলখাল্লার মূল্য পরিশোধ করেননি।

তখন হোজ্জা উত্তর দিলেন,

-আমি তো আলখাল্লার পরিবর্তে জুব্বাটা রেখে গেলাম!

তখন দোকানি বলল,

-আপনিতো জুব্বার মূল্যও পরিশোধ করেননি !

প্রতি উত্তরে হোজ্জা বললেন,

-যেটা আমি নেইনি, তার জন্য মূল্য পরিশোধ করব কেন?

জামা-কাপড় দিয়ে কী হবে?

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা খুব যত্ন করে একটা খাসি পুষতেন। নাদুস-নুদুস সেই খাসিটার ওপর পড়শিদের নজর পড়ল। একদিন কয়েকজন মিলে হোজ্জার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। হোজ্জাকে ডেকে বলল, 'ও হোজ্জা সাহেব! বড়ই দুঃসংবাদ। আগামীকাল নাকি এ দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। হায়! এতো সাধের ঘরবাড়ি, সহায়সম্পদ, এমনকি আপনার ওই প্রিয় খাসিটাও থাকবে না!'

হোজ্জা বুঝলেন তাদের মতলবখানা কী? কিন্তু এতগুলো লোকের বদনজর থেকে খাসিটাকে রক্ষা করা সহজ ছিল না। তাই তিনি মুচকি হেসে পড়শিদের বললেন, 'তাই নাকি? তাহলে দুনিয়া ধ্বংসের আগে খাসিটা জবাই করে খেয়ে ফেলাই ঠিক কাজ হবে। তোমরা কী বলো?'

মতলববাজ পড়শিরা এ সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। তাই তারা হোজ্জার প্রস্তাবে খুশি হল এবং খাসিটা জবাই করে মহাধুমধামে পেট পুরে খেল। তারপর গায়ের জামা খুলে হোজ্জারই বৈঠকখানায় সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে উঠে সবাই দেখল তাদের জামা উধাও! তারা সারা ঘর তন্নতন্ন করে জামা খুঁজতে লাগল। হোজ্জা তখন বললেন, 'ভাইয়েরা! দুনিয়াই যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে জামা-কাপড় দিয়ে কী হবে? তাই আমি সবার জামা আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছি!'

Scanned by CamScanner

আমি গাধা থেকে পড়ে যাইনি

একবার মোল্লা নাসিরুদ্দিন হোজ্জা গাধার উপর চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ করে তিনি গাধার উপর থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। এ অবস্থা দেখে রাস্তার লোকজন হাসতে লাগল। হোজ্জা দেখলেন, তিনি লজ্জা পেতে চলেছেন। সাথে সাথে বলে উঠলেন, 'আরে! তোমরা যা মনে করছ তাই না; আমি লাফালাফি শিখছিলাম। আমি গাধা থেকে পড়ে যাইনি।'

খা এবার খা!

একদিন এক বাড়িতে হোজ্জা মহাধুমধাম করে ভোজানুষ্ঠান হতে দেখলেন। দূর থেকেই তিনি রান্না হওয়া গোশতের ঘ্রাণ শুঁকতে পেলেন। পাকানো গোশতের সুস্বাদু ঘ্রাণ তাকে পাগল করে তুলল। নিজেকে সামলাতে পারলেন না। ওই বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করে দিলেন। বাড়িতে প্রবেশের সময়ই তিনি বাধার সম্মুখীন হন। গেইটের পাহারাদার তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ে বসল।

তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে না দেয়ার কারণ জানতে চাইলেন। পাহারাদার জানালো, তার পরনের কাপড়চোপড় নাকি তেমন ভালো নয়! অতিথিদের সাথে বসে খাওয়ার মতো নয়!

হোজ্জা চিন্তা করলেন, বিষয়টার সমাধান কীভাবে করা যায়! তড়িৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি বাড়িতে গিয়ে চোখ ধাঁধানো উন্নতমানের পোশাক পরে আবার ফিরে আসলেন। এবার গেটের পাহারাদার আর অনুষ্ঠানের সেবকরা যখন তাকে ভালো পোশাকে দেখল, শুভেচ্ছা বিনিময়ের সাথে ভেতরে প্রবেশ করতে দিল।

ভোজানুষ্ঠানে গিয়ে হোজ্জা সব খাবার জামার পকেটে ঢুকাতে লাগলেন আর বলতে থাকলেন, 'খা! এবার খা!'

তার এ কাণ্ড দেখে উপস্থিত লোকেরা খুবই আশ্চর্য হল। তারা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে হোজ্জা?'

তিনি জবাব দিলেন, 'তোমরা তো আর আমাকে গ্রহণ করোনি, গ্রহণ করেছো আমার এই কাপড়কে। সুতরাং এখন কাপড়ই খাবে!'

ঘটনার খবর শুনতে পেয়ে ভোজ আয়োজনের মালিক দৌড়ে এলেন। সবকিছু জানতে পেরে তিনি ক্ষমা চেয়ে বললেন, আসলে পাহারাদার আপনাকে চিনতে পারেনি।

Scanned by CamScanner

হোজ্জা মূলত তার এ কাহিনী দ্বারা বোঝাতে চাইলেন যে, মানুষের সম্মান পোশাক দিয়ে নয়; ব্যক্তিত্ব দিয়ে করতে হয়।

তামালের কৌতুক

নাসিরুদ্দিন হোজ্জার মতো 'তামাল' নামের আরেকজন উসমানি কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। তুর্কিরা আজও তার রসিকতাপূর্ণ গল্প মুখে মুখে বলে ফেরে। তামালের ব্যাপারেও অসংখ্য রসগল্প প্রচলিত আছে।

একদা তামাল ও তার বন্ধু রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। অকস্মাৎ তারা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড দেখতে পেলেন! তামাল ও বন্ধু সাথে সাথে ছুটলেন বিদ্যালয়ের শিশুদেরকে উদ্ধার করতে। তামাল বন্ধুকে বললেন, 'তুমি দেয়ালের উপর উঠে পড়ো। আমি নিচে আছি। তুমি ওপাশ থেকে শিশুদেরকে তুলে দিলে আমি নিচে থেকে তাদের ধরব।'

বন্ধু ওপাশ থেকে প্রথমে একটি ইংলিশ শিশু উদ্ধার করে তামালের হাতে দিল। তামাল তাকে গ্রহণ করে নিচে নিয়ে আসলেন। এরপর বন্ধু আরেকটি ফরাসি শিশু উদ্ধার করে দিল। তামাল সেটিকেও নিচে নিয়ে এলেন। অতঃপর বন্ধু ওপাশ থেকে একটি নিগ্রো শিশু উদ্ধার করে তামালের হাতে দিল। কালো একটি শিশু দেখে এবার তো তামাল চটে গেলেন। শিশুটিকে গ্রহণ না করেই চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'আরে নির্বোধ! জ্বলাপোড়া শিশুকে উদ্ধার না করে ভালো শিশুকে উদ্ধার করো, যাতে সময় নষ্ট না হয়!'[৬]

---

৬. তুর্কপ্রেস ডটকম

Scanned by CamScanner

উসমান বিন আরতুগালের বিদায়ী কথা

উসমান বিন আরতুগালের পুরো জীবন ছিল একটি সংগ্রামী জীবন। 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' আর 'দাওয়াহ ইলাল্লাহ'র জীবন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এসে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আপন সন্তান উরখান বিন উসমানকে কিছু অসিয়ত করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। যে অসিয়তকে ইতিহাস আজও স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছে। এই অসিয়ত উসমান বিন আরতুগালের সংগ্রামী জীবনের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে। সাম্রাজ্য পরিচালনায় তার নীতি কী ছিল–তা বুঝিয়ে দেয়। এই অসিয়তই পরবর্তীকালের উসমানি খেলাফতের মৌলিক সংবিধান বলে বিবেচিত হয়। এটাকেই উসমানি সুলতান আর খলিফাগণ তাদের জীবন চলার পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেন।

উসমান ছেলে উরখানকে বলেন,

> হে আমার ছেলে! এমন কোনো বিষয়ে নিজেকে মশগুল করা থেকে বিরত রাখবে, যে বিষয়কে আল্লাহ তাআলা আদেশ করেননি। আর যখনই তোমার সামনে কোনো সমস্যা দেখা দিবে, তখন উলামায়ে দ্বীনের সাথে পরামর্শ করবে।
>
> ছেলে আমার! তুমি ভালো করেই জানো, আমাদের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি। জেনে রাখো! জিহাদের মাধ্যমেই আমাদের দ্বীনের আলো পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়াবে। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি তখনই হাসিল হবে।
>
> হে আমার ছেলে! আমরা ওইসব শাসকদের মতো নই, যারা শুধুমাত্র শাসন করার জন্য বা জনগোষ্ঠীর উপর কর্তৃত্ব খাটানোর জন্য যুদ্ধ বাঁধাতে থাকে। আমরা এমন এক জাতি, যারা ইসলাম নিয়ে জীবিত হয় এবং ইসলাম নিয়েই মৃত্যুবরণ করে। বৎস আমার! তুমি ওরকম হতে পারো না।
>
> হে আমার সন্তান! যে তোমার আনুগত্য করবে, তাকে তুমি সম্মান করবে। সেনাবাহিনীকে পুরস্কৃত করবে। তোমার সম্পদ ও সেনাবাহিনী দিয়ে শয়তান যেন তোমায় ধোঁকা না দেয়। আর নিজেকে বিজ্ঞ আলেমদের থেকে দূরে রাখবে না।
>
> বৎস আমার! তুমি জেনে রাখো! ইসলামের প্রচার-প্রসার, মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা এবং মুসলিমদের জান-মালের

Scanned by CamScanner

নিরাপত্তা প্রদান করা তোমার ঘাড়ে আমানতস্বরূপ। আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই এ ব্যাপারে জবাবদিহি করবেন।

হে আমার ছেলে! আমি তোমাকে উম্মাহর আলেমদের ব্যাপারে অসিয়ত করে যাচ্ছি। সবসময় তাদের খোঁজখবর রাখবে। তাদের সম্মান করবে। তাদের পরামর্শ মাথা পেতে নেবে। কেননা তারা কল্যাণ ছাড়া কিছু আদেশ করেন না।

বেটা আমার! আমি অচিরেই আল্লাহর সাথে মোলাকাত করে ফেলব। আমি তোমাকে নিয়ে গর্ববোধ করি, তুমি প্রজাদের জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হবে। আল্লাহর দ্বীনকে প্রচারের জন্য একজন মুজাহিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

হে আমার বৎস! দুনিয়াতে এমন কেউ নেই, যে মৃত্যুর সামনে তার মাথাকে নত করবে না। আল্লাহর ইচ্ছায় আমার দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে এসেছে। এ রাজত্ব আমি তোমার হাওয়ালা করে যাচ্ছি আর এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি। প্রতিটি বিষয়কে ইনসাফের সাথে সম্পাদন করবে।[৭]

---

৭. আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ আওয়ামিলুন নুহুজ ওয়া আসবাবুস সুকুত-৪৯, ড. আলি মুহাম্মাদ আস সাল্লাবি। *আল খিলাফাতুল উসমানিয়্যাহ-২৪, আবদুল মুনইম আল হাশিমি। *আল তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যিনা ফিত তারিখ ওয়াল হাজারাহ-১৬, ড. মুহাম্মাদ হরব। *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ-৯২, ইলমাজ অজতোয়ানা। *জাওয়ানিবু মুজিআতুন ফি-তারিখিল উসমানিয়্যিনাল আতরাক-২১, জিয়াদ আবু গুনাইমাহ।

Scanned by CamScanner

ইউরোপ সীমান্তে আশিজন মুজাহিদ

উরখান বিন উসমান (১৩২৬-১৩৬০)। উসমানি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা উসমান বিন আরতুগালের সুযোগ্য সন্তান। পিতার মৃত্যুর পর উসমানি সালতানাতের মসনদে সমাসীন হোন। পিতার মতোই ন্যায়পরায়ণ আর বিচক্ষণতার সাথে সালতানাত পরিচালনা করতে লাগলেন। একদিন সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য মন্ত্রীবর্গ ও 'কাই' গোত্রের বিশিষ্ট লোকজনকে তার দরবারে ডেকে পাঠালেন।

সুলতানের ফরমান পেয়ে সকলেই যথাসময়ে এসে হাজির। বিশাল দরবারে সুলতানের জন্য সবাই চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছেন। ভেতরে ভেতরে সকলেই বেশ কৌতূহলী। সকলেই নিজ নিজ মনকে প্রশ্ন করে চলেছেন-বিষয়টা কী? কেন তাদেরকে নেতাজি ডেকে পাঠালেন? বাইজেন্টাইন সম্রাজ্যের সাথে নতুন কোনো চুক্তি-যাতে তাদের পরামর্শ নেয়াটা জরুরি? কেউ কিছুই জানেন না।

এ নীরবতা বেশিক্ষণ থাকেনি। হঠাৎ দরবারে প্রবেশ করলেন সুলতান উরখান। পিছু পিছু তার বড় ছেলে শাহজাদা সুলায়মান পাশা।

দরবারে ঢুকেই তিনি সালাম করলেন-আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সবাই তার সালামের জবাব দিলেন। তাদের দৃষ্টি সুলতানের দিকে। সকলে তার ফরমানের অপেক্ষায়।

সুলতান উরখান উপবিষ্টদের মাঝে তার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন একনজর। এরপর বললেন,

> 'আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আপনারা জানেন, আমরা 'বুরসা' শহরের উপর কর্তৃত্ব লাভ করতে পেরেছি। বুরসাকে আমাদের সাম্রাজ্যের রাজধানী বানিয়েছি। এর দ্বারা আল্লাহর তাওফিকে আমরা আমাদের মরহুম পিতা সুলতান উসমান বিন আরতুগালের অসিয়ত পূর্ণ করতে পেরেছি। এ অঞ্চলের সব রোমীয় কেল্লা ও দূর্গ বিজয় করে নিয়েছি। এমনকি তাদের সম্রাট 'ষষ্ঠ ইয়েনিজ ক্যান্টকুজিন্যাস' আমাদের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন।
>
> কিন্তু আমার ভায়েরা! এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। আমাদেরকে 'রুমাল্লি' পর্যন্ত পৌছতে হবে। সেখান থেকে আবারও বিজয়ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। সুতরাং আপনাদের মতামত কী?'

Scanned by CamScanner

গাজি ফাজিল বেগ দাঁড়ালেন। তিনি 'কাই' গোত্রের একজন সেনা কমান্ডার। তিনি এমনভাবে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, যা উপস্থিত সবার মাঝে প্রভাব বিস্তার করে ফেলল।

তিনি বললেন, 'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! আমরা তো অনেক দিন থেকেই এরকম একটি সুসংবাদের অপেক্ষা করছিলাম! আল্লাহ আপনাকে হায়াতে তায়্যিবাহ দান করুন। আপনি আগে চলুন। আমরা আপনার সাথে আছি।'

তার কথা উপস্থিত সকলের মাঝেই এক নবপ্রাণের সঞ্চার করল। খুশি আর আবেগের আতিশয্যে একে অপরকে অভিবাদন আর কুলাকুলি করতে লাগলেন।

এ সময় শাহজাদা সুলায়মান পাশা একটু ঝুঁকে পিতার কানে ফিসফিসিয়ে বললেন, আব্বাজান! এ হামলার নেতৃত্ব কি আপনি আমাকে দেবেন না?

টগবগে নওজোয়ান পুত্রের আগ্রহ আর সাহস দেখে পিতার অন্তর খুশিতে ভরে গেল। সে খুশির কিছুটা আমেজ তার ঠোঁটে ঈষৎ মুচকি হাসির রেখা হয়ে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তিনি কিছুটা ইতস্ততবোধ করলেন। এ হামলা সাধারণ কোনো হামলা ছিল না। হামলাটি একজন অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কমান্ডারের মুখাপেক্ষী ছিল। এজন্য তিনি অপরাপর কমান্ডারদের সাথে পরামর্শ করলেন।

-'আমার পুত্র সুলায়মান এই হামলার নেতৃত্ব দিতে চায়! আপনারা কী বলেন?'

কমান্ডাররা শাহজাদা সুলায়মানকে খুব ভালোভাবে চিনতেন। যেসকল যুদ্ধে সুলায়মান তাদের সাথে শরিক ছিলেন, সেসকল যুদ্ধে সুলায়মানের সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদান তারা খুব ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এজন্য তারা জবাব দিলেন,

-ভালো। তিনিই নেতৃত্ব দিবেন। আমরা তার অধীনে থাকব। তার নির্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

-'তাহলে আল্লাহর উপর ভরসা করে এই হামলার নেতৃত্ব তারই উপর ছেড়ে দিচ্ছি। তবে আমার ভাইয়েরা! আমি আশা রাখব, আপনারা তাকে সর্বাত্মক সাহায্য করবেন। সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ চাইলে সুপরামর্শ দিবেন।'

বৈঠক শেষ হয়ে গেল এখানেই।

একদিন ভোরে মুসলিম সেনাবাহিনীতে ব্যাপক রণপ্রস্তুতি দেখা গেল। তলোয়ার ও বর্শাগুলো ধার দেয়া হল। বর্ম পরা হল। ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি পরিবেশকে মুখর করে তুলল। খানিক পরেই খটাখট খটাখট আওয়াজ তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে মুসলিম মুজাহিদরা দক্ষিণ দিকে যাত্রা করল। বন-বাদাড়, রাস্তা-ঘাট-তেপান্তর পাড়ি দিয়ে তারা সমুদ্রতীরে এসে থামল। এখন সামনে দিগন্ত

Scanned by CamScanner

বিস্তৃত অথৈ জলরাশি। সমুদ্রের ওপারে ইউরোপ মহাদেশ। সাগর পাড়ি দিতে পারলেই ইউরোপের মাটি।

সাগরপাড়ে মুসলিম বাহিনী ছাউনি ফেলল। খুঁজতে থাকল সাগর পাড়ি দেয়ার পথ। প্রধান সিপাহসালার শাহজাদা সুলায়মান পাশা কীভাবে সাগড় পাড়ি দেয়া যায়-এই চিন্তায় বিভোর।

সাগরপাড়ে মৃদুমন্দ বাতাসের পরশে আনমনে বসে এ ব্যাপারে চিন্তা করে চলছেন শাহজাদা সুলায়মান। সাগরের অপর তীর খুঁজে ফিরছে তার দৃষ্টি। লঘুপদে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন গাজি ফাজিল বেগ, সাথে যোদ্ধা 'আজাহ বাই'। শাহজাদাকে উদ্দেশ্য করে গাজি ফাজিল বেগ বললেন,

-কী ভাবছেন শাহজাদা মহোদয়?

-চিন্তা করছি কীভাবে এ সমুদ্র পাড়ি দেয়া যায়! ওপারে যাওয়া যায়! তাও গোপনে-যাতে শত্রুপক্ষের কেউ টের না পায়।

-যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা অচিরেই এই সাগর পাড়ি দিতে পারি।

-সেটা কীভাবে?

-আমরা জানতে পেরেছি অদূরে একটি সংকীর্ণ রাস্তা আছে। যে রাস্তা দিয়ে গেলে সহজে সাগড় পাড়ি দেওয়া যাবে এবং সেখানে ইউরোপিয়ানদের একটি দূর্গ আছে।

-ভালো। তাহলে তাই করা যাক।

তারা কয়েকজন মিলে ওই সংকীর্ণ রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছলেন। গাছের গুঁড়ি দিয়ে তারা একটি ছোট নৌকা বানিয়ে নিলেন। রাতের আঁধার নামতেই কয়েকজন যোদ্ধাকে নিয়ে গাজি ফাজিল বেগ, যোদ্ধা আজাহ বাই নৌকায় চড়ে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অপর তীরে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তারা ঘুমন্ত একজন মানুষ দেখতে পেলেন। সুযোগ বোঝে লোকটিকে পাকড়াও করে সিপাহসালার শাহজাদা সুলায়মানের কাছে নিয়ে এলেন।

ভয়ে গ্রেফতারকৃত লোকটি তখন কাঁপছিল। সে মনে করছিলো, এরা তাকে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু শাহজাদা সুলায়মান তাকে অভয় দিলেন। শান্তনার বাণী শোনালেন। নতুন একজোড়া কাপড় পরতে দিলেন। আরও অনেক উপহার দিলেন। উপহার পেয়ে লোকটি অবাক হল!

এবার শাহজাদা সুলায়মান লোকটির কাছে জানতে চাইলেন,

-তুমি কি আমাদেরকে এমন কোনো পথ দেখিয়ে দিতে পারবে, যে পথ দিয়ে আমরা গোপনে ওই দূর্গে প্রবেশ করতে পারব?

-হ্যাঁ, জাঁহাপনা! আমি পারব। আমি দূর্গটাকে খুব ভালোভাবেই চিনি।

Scanned by CamScanner

-সত্যিই যদি তুমি তা পারো, তবে তোমাকে অনেক বড় পুরস্কার দেওয়া হবে।
-আমি আপনাকে ওয়াদা দিচ্ছি জাঁহাপনা! কেউ টের পাবে না!

শাহজাদা সুলায়মান তাড়াতাড়ি আরও বড় আকৃতির কিছু নৌকা তৈরির ফরমান জারি করলেন। পরদিন বিকেলে তিনি আশিজন যোদ্ধা নির্বাচন করলেন। এদের নিয়েই তিনি চড়ে বসলেন সদ্য তৈরি নৌকাগুলোতে। রাতের ঘনকালো অন্ধকারে খুব তাড়াতাড়ি সাগরের ওই পাড়ে পৌঁছে গেলেন। কেউ টের পেল না। দূর্গে প্রবেশের জন্য গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি একটি গোপন সুড়ঙ্গপথ দেখিয়ে দিল।

উল্লেখ্য, ঐতিহাসিকদের মতে, ওই সুড়ঙ্গপথটি ছিল দূর্গের ভেতর থেকে সাগরে ময়লা পানি নিষ্কাশন করার নালা।

সিপাহসালার শাহজাদা সুলায়মান নির্বাচিত আশিজন সৈন্য নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে দূর্গের ভেতরে চলে গেলেন। তখন ছিল ফসল কাটার মওসুম। দূর্গের বেশিরভাগ লোক দূর্গের বাইরে বাগান ও শষ্যক্ষেত্রে ফসল কাটতে ব্যস্ত ছিল। তাই দূর্গ বিজয় করতে কোনো বেগ পেতে হয়নি। কোনো ধরনের রক্তপাতের প্রয়োজন হয়নি। দূর্গের ভেতর যারা ছিল, তারা সহজেই আত্মসমর্পণ করল। মুসলমানদের সাদরে বরণ করে নিল। যেহেতু মুসলমানরা তাদেরকে কোনো কষ্ট দেয়নি।

শাহজাদা সুলায়মান তখনই কিছু লোককে পাঠিয়ে সাগরপাড়ে দূর্গের নোঙর করা নৌকাগুলো দখল করে ওপারে রেখে আসা বাকি সৈন্যদের নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণ পর সাগর পাড়ি দিয়ে এসে বাকি সৈন্যরাও হুড়মুড় করে দূর্গে প্রবেশ করল।

এরপর শাহজাদা সুলায়মান দূর্গ বিজয়ের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার আগেই পার্শ্ববর্তী আরেকটি বড় দূর্গে অকস্মাৎ আক্রমণ করে বসলেন। দূর্গবাসী কিছু বোঝে ওঠার আগেই দূর্গ পদানত করে ফেললেন! দূর্গবাসী অবশেষে আত্মসমর্পণ করে নিল।

এভাবেই দুই দুইটি বড় দূর্গ বিজয় করে নেয়ার দ্বারা মুসলমানগণ সর্বপ্রথম ইউরোপের মাটিতে পা রেখেছিলেন। এখান থেকেই পতপত করে ইউরোপের আকাশে উড়েছিল মুসলমানদের বিজয় কেতন।

ঐতিহাসিকদের মতে, বিজিত এই এলাকা ছিল ইউরোপের বর্তমান বলকান অঞ্চল।[৮]

---

৮. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-১১, উরখান মুহাম্মাদ আলি। *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ-৯৫, ইয়ালমাজ অজতোয়ানা।

Scanned by CamScanner

কালেমা পড়াতে গিয়ে শাহাদতবরণ

সুলতান প্রথম মুরাদ (১৩২৬-১৩৮৮)। সুলতান উরখান বিন উসমানের সুযোগ্য সন্তান। পিতার মৃত্যুর পর উসমানি সালতানাতের মসনদে সমাসীন হন। তিনি ছিলেন জিহাদের ময়দান দাবড়িয়ে বেড়ানো একজন বীর যোদ্ধা। সুদীর্ঘ শাসনকালের অন্তত ত্রিশ বছর কেবল বিজয়াভিযানেই অতিবাহিত করেছেন। তিনি যখন উসমানি সালতানাতের মসনদ অলঙ্কৃত করেন, তখন উসমানি সালতানাতের আয়তন ছিল একলক্ষ কিলোমিটার। কিন্তু তিনি অনেক ত্যাগের বদৌলতে তা চারগুণ বর্ধিত করে চারলক্ষ কিলোমটারে রূপান্তরিত করেন। তার বেশিরভাগ অভিযান ছিল ইউরোপে। সুলতান প্রথম মুরাদের ধারাবাহিক বিজয়ে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠেছিল।

ইউরোপের ভূমিতে সুলতান প্রথম মুরাদের বিজয়াভিযান ঠেকাতে এবং ইউরোপ ভূখণ্ড থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করতে বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি এক চুক্তি করল। তারা হাঙ্গেরির সম্রাট লুইস-এর নেতৃত্বে সুলতান প্রথম মুরাদের মোকাবিলায় ব্যাপক রণপ্রস্তুতি নিয়ে উসমানি সালতানাতের সীমানার দিকে এগোতে শুরু করল।

সুলতান প্রথম মুরাদ তার অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে তখন সালতানাতের তৎকালীন রাজধানী বুরসাতে অবস্থান করছিলেন। সুলতানের একজন কমান্ডার 'হাজি ইলবি' ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে সীমান্তেই অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন শুনতে পেলেন, ইউরোপবাসী হাঙ্গেরির সম্রাটের নেতৃত্বে বিশাল সেনাবহর নিয়ে উসমানি সেনাবাহিনীর উপর হামলা করতে সীমান্তের কাছাকাছি চলে এসেছে, তখন তিনি তার ১০ হাজার বাহিনী নিয়েই তাদের মোকাবেলা করতে রওনা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে উভয় বাহিনীই মুখোমুখি হয়ে গেল।

ইউরোপ বাহিনী উসমানি বাহিনীর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ছিল। তারা জানতে পেরেছিল, অনতিদূরেই স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের উসমানি বাহিনী তাবু ফেলেছে। তাই তারা উসমানিদের পক্ষ থেকে আক্রমণাত্মক হামলা না হওয়ার ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল। তাদের ধারণাই ছিলো না এতো অল্পসংখ্যক উসমানি সৈন্য তাদের উপর হামলা করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে। কিন্তু তাদের ধারণাকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত করে উসমানি সেনা কমান্ডার 'হাজি ইলবি' তাদের উপর অতর্কিতে হামলা করে বসলেন! কিছু বোঝে ওঠার আগেই তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন।

Scanned by CamScanner

এ যুদ্ধে উসমানিদের বিজয়সংবাদ গোটা ইউরোপবাসীর উপর বজ্রাঘাত করল। ইউরোপকে উসমানিদের থেকে মুক্ত করার আশা দুরাশায় পরিণত হল। তবুও বাবা পঞ্চম এ্যারিয়েন গোটা ইউরোপকে উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানালেন। কিন্তু ইউরোপবাসীর উপর ভয় এতোটাই জেঁকে গিয়েছিল যে, ইউরোপের কোনও সম্রাটই উসমানিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার আর সাহসটুকু পেল না।

কিন্তু ইউরোপের জমিতে উসমানিদের বিজয়াভিযানকে ঠেকাতে সার্বিয়া, বসনিয়া, আলবেনিয়া ও পোল্যান্ড এক বিশাল সেনাবহর জমায়েত করল। এ সেনাবহর সংখ্যায় এতো বেশি ছিল যে, সবার মুখে মুখে প্রবাদ ছড়িয়ে পড়ল–যদি আসমানও আমাদের উপর টুটে পড়তে চায়, তবুও আমরা তা আমাদের যুদ্ধের সরঞ্জামাদি দিয়ে আটকিয়ে নেব!

অবশেষে এক টানটান উত্তেজনাকর পরিস্থিতির পর উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল 'কসোভো'র ময়দানে। উসমানি বাহিনীর আগেই ইউরোপিয়ান বাহিনী ময়দানে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই তারা ময়দানের উঁচুউঁচু টিলা আর ঢিবির ওপর পজিশন নিয়ে তাবু ফেলল। এতে যুদ্ধের ইতিবাচক দিক তাদের বাগডোরে চলে আসল।

যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগের রাতে সুলতান প্রথম মুরাদ আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করে কায়মনোবাক্যে দোয়া করতে লাগলেন–

> 'হে মওলা! তোমার প্রিয় হাবিবের খাতিরে... কারবালার ময়দানে প্রবাহিত পবিত্র রক্তের খাতিরে... তোমার ভয়ে চোখগুলোর নির্ঝরিত অশ্রুর খাতিরে... তোমার ইশকে মোহগ্রস্ত চেহারাগুলোর খাতিরে...
>
> তুমি মুসলিমদের সাহায্য করো! আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে দাও! আমাদের ভুল-ত্রুটির কারণে মুজাহিদদের পরাজিত করো না! ছত্রভঙ্গ করে দিও না! জনগণের কাছে আমাদের চেহারাগুলোকে কালো করে দিও না!
>
> ও মালিক! আমাকে তোমার দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করে দাও! তোমার রাস্তায় আমাকে শাহাদাতের জন্য কবুল করে নাও!'

পরদিন ভোরে ১৩৮৯ সালের ১৫ জুন উভয় বাহিনী কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়াল। সুলতান প্রথম মুরাদ, তার সুযোগ্য সন্তান ও মসনদের উত্তরাধিকারী প্রথম

Scanned by CamScanner

বায়েজিদ, কমান্ডার ও মন্ত্রীবর্গ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তলোয়ার হাতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রদর্শন করতে লাগলেন বীরত্বের নৈপুণ্য। শাহজাদা প্রথম বায়েজিদের তলোয়ারের ভূমিকা ছিল একেবারে বজ্রাঘাতের মতো। তিনি শত্রুবাহিনীর কাতারের পর কাতার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দুর্বারগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলেন। তার তলোয়ার উত্তোলন করামাত্রই কারো ধড় থেকে মস্তক উড়ে যেতে দেখা গেল বা অঙ্গহানি হয়ে কাউকে ভূপাতিত হতে দেখা গেল। তিনি বীরত্বের এমন চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন যে, ১৯৮৬ সালের কোনো এক যুদ্ধে তাকে যে 'ইলদারম' বা 'বজ্রকড়ক' উপাধি দেয়া হয়েছিল–তা আবারও নতুন করে প্রমাণিত হল।

ওইদিনই বিকেলে শত্রুবাহিনী অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করল। আবারও ইউরোপের দম্ভ ও অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। গোটা ইউরোপ জগতের জন্য কসোভোর ময়দান হয়ে গেল এক বিষাদময় ও বেদনাবিধুর উপত্যকার নাম।

পরদিন সুলতান প্রথম মুরাদ তার কমান্ডার, মন্ত্রী ও সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে যুদ্ধের মাঠ পরিদর্শনে বের হলেন। বিস্তৃত মাঠ জুড়ে লাশ আর লাশ! এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে উভয় দলেরই লাশ। লাশগুলোকে ঘিরে চিল-শকুন-কাকের আনকোরা রব, স্থানে স্থানে জমাটবাঁধা রক্তের দুর্গন্ধ আর মারাত্মক আহতদের গোঙানিতে সৃষ্টি হল এক বিভীষিকাময় পরিবেশ!

সুলতান প্রথম মুরাদ আহতদের খোঁজ করতে পুরো মাঠ ঘুরতে থাকলেন। যখনই কোনো আহত সৈন্য দৃষ্টিগোচর হতো, তাকে স্থানান্তরিত করে নিয়ে ব্যান্ডেজ-পট্টি বেঁধে দিয়ে চিকিৎসা করার নির্দেশ দিতেন।

পুরো মাঠে তিনি আহতদের খোঁজ করছিলেন। ইত্যবসরে এক কমান্ডার এসে তাকে বলল,

-জাঁহাপনা! ওখানে লাশের সারিতে একজন সার্বিয়ান সেনা আহত হয়ে পড়ে আছে। সে আপনার চেহারা অবলোকন করে ধন্য হতে চায় এবং আপনার মোবারক হাতেই ইসলাম গ্রহণ করতে চায়।

-কোথায় সে?

-ওইখানে জাঁহাপনা!

Scanned by CamScanner

-চলো, তাহলে আমরা ওদিকে যাই। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে আগ্রহী সৈন্যকে আমরা বরণ করে নেই।

আহত সৈন্যটি ছিল সার্বিয়ার এক চালাক ও চতুর সৈন্য। সৈন্যটি মারাত্মক আহত ছিল। সে প্রকৃতপক্ষে ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী ছিল না; বরং মুসলিমদের সুলতান প্রথম মুরাদের ব্যাপারে এক দুরভিসন্ধি করে রেখেছিল, যিনি 'কসোভো'র ময়দানে গোটা ইউরোপের মুখাবয়বে আবারও অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে পরাজয়ের চুনকালি মেখে দিয়েছেন! সে তার ইউনিফর্মের ভেতরে একটি ধারালো খঞ্জর লুকিয়ে রেখেছিল।

সুলতান যখন সার্বিয়ান ওই সৈন্যের দিকে এগিয়ে গেলেন তখন তার সাথে ছিলেন শাহজাদা বায়েজিদ, সালতানাতের মন্ত্রী, কমান্ডার এবং কিছু সৈন্য। সুলতানকে দেখেই সৈন্যটি উঠে দাঁড়াল। সুলতানের দিকে এককদম-দুকদম করে এগিয়ে এল। তার অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, সে সুলতানের হাতে চুমু খেতে আগ্রহী। কিন্তু না, হতভাগাটা সুলতানের নিকটবর্তী হতেই চোখের পলকে তার লুকায়িত খঞ্জরটি বের করে সুলতানের বুকে সজোরে বিদ্ধ করে দিল!

মুহূর্তের মধ্যেই সুলতান মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। উপস্থিত সকলেই ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে হয়রান হয়ে গেল! এ কী? হতভাগা ইসলাম গ্রহণের কথা বলে মহামান্য সুলতানকে খুন করে ফেলল! সুলতান মুখ দিয়ে কিছুই উচ্চারণ করতে পারলেন না। শুধুমাত্র একটি কথা বললেন–

-এটাই আমার তাকদির...বায়েজিদ যেন আমার উত্তরাধিকারী হয়...

এরপর সুলতান প্রথম মুরাদ শাহাদাতাইন পাঠ করে চিরতরের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। এভাবেই আল্লাহ তাআলা সুলতান প্রথম মুরাদের শাহাদাতের তামান্নাকে পূর্ণ করেছিলেন। এরপর উসমানিরা সুলতানের মরদেহকে বহন করে 'বুরসা' অভিমুখে যাত্রা করল।

আর ওই সার্বিয়ান সৈন্য? তাকে তো তখনই উপস্থিত উসমানি সৈন্যরা তলোয়ারের উপর্যুপরি আঘাতে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল।[১]

---

১. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-১৭, উরখান মুহাম্মাদ আলি। *আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ আওয়ামুলুন নুহুজ ওয়া আসবাবুস সুকুত-৫৯, ড. আলি মুহাম্মাদ আস সাল্লাবি।

Scanned by CamScanner

অধিকার ও যোগ্যতা

সুলতান প্রথম বায়েজিদ (১৩৬০-১৪০৪)। সুলতান প্রথম মুরাদের সুযোগ্য সন্তান। তাকে উপাধি দেয়া হয়েছিল 'ইলদারম'। অর্থাৎ বজ্রকড়ক। অসাধারণ সাহসিকতা, বীরত্ব, মহানুভবতা আর ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার কারণে উসমানিরা তাকে এই উপাধি দিয়েছিল। ইউরোপের রাজা-প্রজাদের জন্য তিনি ছিলেন জমদূত। ১৩৯১ সালে বাইজেন্টাইন সম্রাট 'ম্যানুয়েল'-এর শাসনামলে কনস্টান্টিনোপল ঘেরাও করে গোটা খ্রিস্টজগতকে ভড়কে দিয়েছিলেন। তাই ১৩৯৩ সালে ম্যানুয়েলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা 'ভেনিজিয়া' শহরে সমবেত হল। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, গোটা ইউরোপে এই সংবাদ প্রেরণ করতে হবে–ইউরোপের সব সম্রাটরা যেন উসমানিদের বিরুদ্ধে শক্তি ও সৈন্য যোগাড় করে এবং উসমানিদেরকে ইউরোপ থেকে বিতাড়িত করে।

অপরদিকে হাঙ্গেরির শাসক 'সিগমুন্ড'- বুলগেরিয়ার সম্রাট 'শিশম্যান'র সাথে উসমানিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এক গোপন চুক্তি করে বসল। এ চুক্তির বিষয় ছিল–"উসমানি সুলতান প্রথম মুরাদ ইউরোপের যে ভূখণ্ডটি জয় করেছিলেন, তা ফিরিয়ে আনা।"

সুলতান প্রথম বায়েজিদ এ চুক্তির খবর শুনেই বুলগেরিয়ার দিকে এক শক্তিশালী সেনাবহর প্রেরণ করলেন। সেনাবহরটি বুলগেরিয়ার রাজধানী টরনোভো পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হল। অবরোধ করল। বিজয় ছিনিয়ে আনল। শুধু তাই নয়; সামনে বেড়ে দানুব নদীর আশপাশের সালসেটরা, নিগবুলি ও ফিদান এলাকা বিজয় করে নিল। শিশম্যান সম্রাটকে বন্দি করে 'এডির্নে' নিয়ে আসা হল। তৎকালে 'এডির্না' ছিল উসমানি সালতানাতের রাজধানী। এভাবেই পুরো বুলগেরিয়া উসমানি সালতানাতের অধীনে চলে এসেছিল।

সুলতান প্রথম বায়েজিদের দ্রুত এ বিজয়োন্নতি দেখে হাঙ্গেরির সম্রাট সিগমুন্ড ভড়কে গেল। সে অনুভব করতে পারল, এবার তার পালা! কিন্তু তবুও তার শৌর্য-বীর্য ও প্রতাপ দেখানোর ইচ্ছা করল। এবং এও প্রদর্শন করতে চাইল যে, সে কাউকে ভয় করে না। এ উদ্দেশ্যে সে সুলতান প্রথম বায়েজিদর কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করল।

Scanned by CamScanner

প্রতিনিধিদল তাদের সম্রাটের পক্ষ থেকে একটিমাত্র কথা বলার ব্যাপারে আদিষ্ট ছিল। আর তা হল–

'কোন অধিকার আর যোগ্যতার বলে আপনারা বুলগেরিয়ায় হামলা করতে প্রস্তুত হলেন?'

সুলতান প্রতিনিধিদলের কথা শোনার পর শুধু একটু মুচকি হাসলেন আর বললেন,

'ভালো! এখনই আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব, কোন অধিকার আর যোগ্যতার বলে আমি বুলগেরিয়ায় হামলা করলাম।'

এই বলে তিনি প্রহরীর কানে ফিসফিসিয়ে পবিত্র কুরআন কারিম নিয়ে আসার আদেশ করলেন। প্রহরী কুরআন কারিম নিয়ে আসার পর তিনি প্রথমে কুরআনের মধ্যে চুমু খেলেন। অতঃপর কুরআনকে ডান হাত দিয়ে ধরলেন আর বাম হাত দিয়ে তলোয়ার ধরলেন। এরপর ডান হাত দিয়ে কুরআন উঁচিয়ে ধরে প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন,

'এটারই অধিকারে হে প্রতিনিধিরা! এই কুরআনের অধিকারে!'

এরপর তার বাম হাত দিয়ে তলোয়ার উত্তোলন করে বললেন,

'এটার যোগ্যতায় হে প্রতিনিধিরা! এই তলোয়ারের যোগ্যতার বলে!'

সুলতানের এই জবাব শুনে প্রতিনিধিরা তার দরবার থেকে মস্তক অবনত করে বেরিয়ে গেল![১০]

---

১০. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-২৫. উরখান মুহাম্মাদ আলি।

Scanned by CamScanner

সাক্ষ্য প্রদানের অযোগ্য সুলতান

সুলতান প্রথম বায়েজিদকে কোনো এক বিষয়ে আদালতে তখনকার প্রসিদ্ধ আলেম ও বিচারপতি 'শামসুদ্দিন ফানারি'র সামনে সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য ডাকা হল। সুলতান যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হলেন এবং আদালতে বিচারপতির সামনে কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হলেন। স্বাভাবিকভাবেই একজন সাক্ষীর মতো হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বিচারক সুলতানের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। চোখ পাকিয়ে সুলতানের দিকে কটমট করে কতক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন,

> 'আপনার সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ, আপনি জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করেন না। আর যে লোক শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ওজর ছাড়া জামায়াত পরিত্যাগ করবে, সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে তাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা হবে!'

জনাকীর্ণ আদালতে বিচারপতির এই কথাটি উপস্থিত সবার মাথায় যেন বজ্রাঘাত করল! এটা নিছক কোনো কথা নয় শুধু; সুলতানের বিরুদ্ধে বিরাট এক অভিযোগও বটে! উপস্থিত লোকেরা অপেক্ষা করতে লাগল, কখন সুলতানের এক ইশারায়ই বিচারকের ধড় থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে! কিন্তু না, সুলতান কিছুই বললেন না; বরং শান্ত হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন! কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একসময় হনহন করে কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে গেলেন!

ওই দিনই সুলতান তার রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে একটি মসজিদ নির্মাণের ফরমান জারি করলেন। নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গেলে মসজিদ উদ্বোধন করে মসজিদেই জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করতে শুরু করলেন।[১১]

---

১১. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-১৭, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

Scanned by CamScanner

মসজিদের মধ্যখানে ওজুর হাউজ

'বুরসা'। তুরস্কের চতুর্থ বৃহত্তম শহর। ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারার মাঝামাঝি অবস্থিত। উসমানি খেলাফতের প্রাচীন রাজধানী। বুরসা শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদ হল 'উলু জামে মসজিদ'। সুলতান প্রথম বায়েজিদ তার শাসনকালে ১৩৯৬-১৪০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে সালজুকি নির্মাণশিল্পের আদলে মসজিদটি নির্মাণ করান। তৎকালীন প্রসিদ্ধ স্থাপত্যবিদ 'আলি নিসার' মসজিদটি নির্মাণ করেন। উসমানি সালতানাতের প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম প্রতীক এ মসজিদে বিশটি গম্বুজ ও দুটি মিনার রয়েছে।

বর্ণিত আছে, সুলতান প্রথম বায়েজিদ অঙ্গীকার করেছিলেন, তিনি যদি 'নিকোপলিস' যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তাহলে বিশটি মসজিদ নির্মাণ করবেন। পরবর্তীতে তিনি নিকোপলিস যুদ্ধে জয়লাভ করলেও বিশটি মসজিদ নির্মাণ করতে সক্ষম হননি। তাই তখনকার উলামায়ে কেরামের কাছে তার কৃত অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে সমাধান চেয়েছিলেন। তখনকার উলামায়ে কেরাম এই সমাধান দিয়েছিলেন যে, তিনি যদি একটি মসজিদ নির্মাণ করে সেই মসজিদে বিশটি গম্বুজ স্থাপন করেন, তাহলে তার কৃত অঙ্গীকার পূরণ হয়ে যাবে। সে হিসেবেই সুলতান তার নির্মিত 'উলু জামে মসজিদে' বিশটি গম্বুজ স্থাপন করেছিলেন।

তবে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, এ মসজিদের ঠিক মধ্যখানে রয়েছে ওজুর হাউজ! মুসল্লিরা এ হাউজ থেকে ওজু করে! কিন্তু ওজুর হাউজটি মসজিদের ঠিক মাঝামাঝি কেন–তা জানতে হলে আরেকটি কাহিনী জানতে হবে।

মসজিদটি যে স্থানে আছে, সেই স্থানে বেশ কিছু ঘরবাড়ি ছিল। উসমানি প্রশাসন ঘরবাড়িগুলো ভেঙে মসজিদ নির্মাণের জন্য বাড়ির মালিকদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্য দিয়ে জায়গা খরিদ করে নিল। কিন্তু বেঁকে বসলো একজন মালিক। সে ছিল খ্রিস্টান। সে তার ঘর বিক্রি করতে নারাজ। সবাই বিক্রি করলেও সে করবে না। বিশেষ করে সে যখন জানতে পারল, মসজিদের মূলভিত্তি তারই ভিটেমাটিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। তার ভিটেমাটিতে মুসলমানরা মসজিদ বানিয়ে সিজদাহ করবে–এটা সে মেনে নিতে পারছিল না। এখন তো বিষয়টি কঠিন হয়ে গেল। কারণ, এই একটিমাত্র ঘরের কারণে মসজিদ নির্মাণ করা যাচ্ছে না।

খেলাফতের লোকেরা প্রশাসনের কাছে বিষয়টি অবহিত করল। উসমানি প্রশাসন বিষয়টির শরয়ি সমাধানের জন্য শায়খুল ইসলামের কাছে ফাতওয়া

Scanned by CamScanner

তলব করল। শায়খুল ইসলাম এই মর্মে ফতোয়া দিলেন যে, যেকোনো মূল্যে ঘরের মালিককে রাজি করিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় এখানে মসজিদ বানানোর চিন্তা বাদ দিতে হবে। কারণ, পরিকল্পিত জায়গায় ওই ঘরওয়ালার মালিকানা রয়েছে। তার মালিকানাধীন বস্তুর ব্যবহারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার ওপর কোনো বলপ্রয়োগ করা যাবে না। 'ইসলাম' এর অনুমতি দেয় না। বেশি থেকে বেশি তাকে মিনতি করে বোঝানোর চেষ্টা করা যেতে পারে।

খেলাফতের লোকজন আবারও তাকে বোঝাল; কিন্তু যেই সেই। সে তার ঘরের জায়গা বিক্রি করবে না! কী আর করা। শেষ চেষ্টা হিসেবে লোকজন তাকে দ্বিগুণ মূল্য প্রদানের লোভ দেখাল। দ্বিগুণ মূল্যের কথা শুনে সে রাজি হয়ে গেল। তবে একটি শর্তারোপ করল, তার ভিটের উপর মসজিদের মূল ভিত্তি রাখা যাবে না। আশপাশে রাখতে হবে। মসজিদের বাইরের অংশে তার ভিটেমাটি থাকতে হবে।

লোকজন খলাফতের প্রশাসনকে খ্রিস্টান লোকটির এ শর্ত সম্পর্কে অবহিত করল। প্রশাসন আবারও শায়খুল ইসলামের ফাতওয়া তলব করল। শায়খুল ইসলাম ফাতওয়া দিলেন, 'খ্রিস্টানের শর্ত গ্রহণযোগ্য। মসজিদ নির্মাণের সময় এ শর্ত বিবেচনাযোগ্য'।

খ্রিস্টান ব্যক্তির শর্ত মেনে নেয়া হল। উসমানি ইঞ্জিনিয়াররা মসজিদের ম্যাপও এঁকে নিলেন। কিন্তু দেখা গেল, ওই ঘর মসজিদের আওতায় চলে এসেছে! এখন কী করা?

ইঞ্জিনিয়াররা তড়িৎ একটি বুদ্ধি করে নিলেন। তারা খ্রিস্টান লোকটির ঘরের জায়গায় মসজিদের ওজুর হাউজ বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা ম্যাপের মধ্যে ওজুর হাউজের চিত্র অঙ্কন করলেন। ওজুর হাউজটি পড়ে গেল মসজিদের ঠিক মধ্যখানে!

ম্যাপানুসারেই মসজিদ নির্মিত হল। খ্রিস্টান মালিকের শর্তানুযায়ী তার ভিটেমাটিকে সিজদাহর আওতা থেকে বাইরে রাখা হল। সেখানে তৈরি হল ওজুর হাউজ। আজও ওজুর এই হাউজটি 'উলু জামে মসজিদ'র মধ্যখানে কালের সাক্ষী হয়ে আছে।[১২]

---

১২. তুর্কপ্রেস ডটকম। *উইকিপিডিয়া অর্গ। *তুর্কিয়া আল উসমানিয়্যাহ (ফেইসবুক পেইজ)।

Scanned by CamScanner

সমুঞ্জি বাবা

এটা একজন আল্লাহর ওলির কিচ্ছা। তার নাম 'হামিদ আকসর ইলি'। কিন্তু 'বুরসা' শহরের লোকেরা তাকে সমুঞ্জি বাবা নামে চিনত। কারণ, তুর্কি ভাষায় সমুঞ্জি অর্থ রুটি। তিনি বুরসার অলি-গলিতে ঘুরে ঘুরে রুটি বিক্রি করতেন। তিনি 'কিসরা' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শাম, তিবরিজ ও ইরানের আর্দবেল শহরে সফর করে ইলম অর্জন করেন। আর্দবেলের প্রসিদ্ধ আল্লাহওয়ালা আলাউদ্দিন আর্দবেলিকে আঁকড়ে ধরেন। দীর্ঘসময় তার খেদমতে থাকেন। এভাবে একদিন তাসাওউফ তথা আধ্যাত্মিক জগতে বিরাট জায়গা দখল করে নেন। তিনিও হয়ে যান তার শায়খের মতো একজন আল্লাহর ওলি। এরপর তিনি বুরসা শহরে ফিরে আসেন। এখানেই বসবাস করতেন। তখনকার সময়ে বুরসা উসমানি সালতানাতের রাজধানী ছিল। তখন ছিল সুলতান প্রথম বায়েজিদের শাসনকাল।

বুরসা শহরে বেশ কয়েকবছর তিনি তার জীর্ণ-শীর্ণ কুটিরে দিনাতিপাত করেন। এ কুটিরেই তিনি রুটি বানিয়ে বড় একটি খাঞ্চায় ভরে বিক্রির জন্য বুরসার অলি-গলিতে ঘুরতেন। শিশুরা তাকে দেখামাত্রই চিৎকার করে বলে উঠত–সমুঞ্জি বাবা এসে গেছেন...সমুঞ্জি বাবা এসে গেছেন...

খুব তাড়াতাড়ি শিশুরা তার আশেপাশে জমায়েত হয়ে জটলা পাকিয়ে নিতো। তারা তার কাছ থেকে রুটি খরিদ করত। বুরসার সব শিশু-কিশোর ও অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসত। তার চেহারা ছিল উজ্জ্বল। এক অলৌকিক জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়। তিনি শিশু-কিশোরদের খুবই ভালোবাসতেন। তাদের সাথে খুনসুটিতে মেতে ওঠতেন। হৃদয়ের গভীর থেকে আদর করতেন, স্নেহ করতেন। আবার তার রুটি ছিল খুবই নরম ও সুস্বাদু।

যখন সুলতান প্রথম বায়েজিদ 'উলু জামে মসজিদটি' নির্মাণ করতে শুরু করলেন, তখন মসজিদের নির্মাণ শ্রমিকরা 'সমুঞ্জি বাবা' থেকে রুটি কিনে খাওয়া শুরু করল। তারা নিয়মিত তার কাছ থেকে রুটি কিনত। এভাবে তাদের সাথেও সমুঞ্জি বাবার বেশ হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়ে গেল। দেখতে দেখতে একসময় 'উলু জামে মসজিদ'র নির্মাণকাজ শেষ হয়ে গেল। মসজিদটি ছিল এক চিত্তাকর্ষক মসজিদ হয়ে সগর্বে দাঁড়াল বুরসার আকাশে। মসজিদটি ছিল ইসলামি অট্টালিকার এক অন্যতম দৃষ্টান্ত। উসমানি সালতানাতের সভ্যতার এক নয়নকাড়া দলিল।

Scanned by CamScanner

মসজিদ উদ্বোধনের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। আর তা শুরু হবে জুমআর নামাজের মাধ্যমে।

জুমআর দিন সুলতান প্রথম বায়েজিদ মন্ত্রীবর্গ, উলামা ও বুরসার জনগণকে নিয়ে নবনির্মিত উলু জামে মসজিদে প্রথম নামাজ পড়তে আগমন করলেন। প্রশস্ত আঙিনার মসজিদটি কানায় কানায় ভরে গেল। সুলতান ডানে বামে তাকিয়ে বুরসার প্রসিদ্ধ আলেম আমির সুলতানকে দেখতে পেলেন। তাকেই খুৎবা দিয়ে নামাজ পড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট করলেন।

আমির সুলতান মিম্বরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। জনাকীর্ণ মসজিদে তিনি অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। দেখে মনে হচ্ছে, তার চোখজোড়া কাউকে খুঁজে চলছে। হ্যাঁ, তার চোখ সত্যিই একজনকে খুঁজে চলছে। তিনি হলেন 'সমুঞ্জি বাবা'। তিনি সমুঞ্জি বাবার ইলম ও মর্যাদা ভালোভাবে জানেন। যদিও আর কেউ তা জানে না। তারা তাকে একজন রুটিওয়ালা ছাড়া আর কিছুই জানত না। একসময় তার দৃষ্টি সমুঞ্জি বাবার ওপর গিয়ে পড়ল। 'সমুঞ্জি বাবা'র ওপর তার দৃষ্টি পড়তেই তিনি তার দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করে একটি কথা বলেছিলেন, যা উপস্থিত সকলেই শুনতে পেরেছিলেন–'এ মসজিদে খুৎবা প্রদানের জন্য এই ব্যক্তির চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই!'

উপস্থিত মুসল্লিরা অবাক হল! তারা আমির সুলতান যেদিকে ইঙ্গিত করেছেন, সেদিকেই অবাক দৃষ্টিতে তাকাতে শুরু করল! অবস্থা আঁচ করতে পেরে সমুঞ্জি বাবা অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। কারণ, দীর্ঘ কয়েক বছর তিনি তার প্রকৃত অবস্থা লুকিয়ে রাখতে পারলেও আজ আর পারলেন না। আমির সুলতান তার প্রকৃত অবস্থা ফাঁস করে দিলেন! এতোদিন তো তাকে লোকেরা একজন সাধারণ রুটিওয়ালা বৈ আর কিছু জানতো না। কিন্তু আজ সব জানাজানি হয়ে গেল!

বাধ্য হয়ে তিনি দাঁড়ালেন। মিম্বরের দিকে এগিয়ে গেলেন। জনাকীর্ণ বিশাল মসজিদের চোখগুলো তার দিকে এক অবাক ভঙ্গিতে তাকাচ্ছিল! মিম্বরে আরোহণের আগে তিনি একটু ঝুঁকে আমির সুলতানের কানে কানে একটু অনুযোগের সুরে বললেন,

'এ কী করলেন ভাই! সব মানুষের সামনে আমায় ফাঁস করে দিলেন?'

আমির সুলতানও কানে কানে উত্তর দিলেন,

Scanned by CamScanner

'এ মসজিদে খুৎবা দেয়ার জন্য আপনিই যে একমাত্র উপযুক্ত ভাই!'

ছদ্মবেশী ওলি অবশেষে মিম্বরে আরোহণ করলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুলের ওপর সালাতের পর তিনি প্রথমে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করলেন। এরপর সাতটি পন্থায় সুরা ফাতিহার তাফসির করতে শুরু করলেন। এটা ছিল একটি খুৎবা, একটি সুন্দর তাফসির; যা উপস্থিত আম-খাস সকল মুসল্লির অন্তর জয় করে নিয়েছিল!

এই জুমআয় তখনকার প্রসিদ্ধ আলেম 'মোল্লা ফানারি'-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই খুৎবা শুনে খুবই আশ্চর্য হলেন। জুমআ শেষ হয়ে গেলে তিনি তার সঙ্গীদের বলেছিলেন, 'আমরা এই ব্যক্তিটাকে দেখলাম। তার খুৎবা শোনলাম। ইলম ও তাফসিরের মধ্যে তার গভীর পাণ্ডিত্য অনুভব করলাম। তিনি যে সাত পন্থায় সুরা ফাতিহার তাফসির করেছেন, সেই তাফসিরসমূহের মধ্যে প্রথম পন্থার তাফসির উপস্থিত সকলেই বোঝেছে। দ্বিতীয় পন্থার তাফসির প্রায় অর্ধাংশ লোক বোঝেছে। তৃতীয় পন্থার তাফসির গুটিকতেক বিশেষ লোক বুঝতে পেরেছে। আর চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পন্থার তাফসির আমাদেরও বোঝের বাইরে ছিল!'

বিদ্যুৎগতিতে খবরটা পুরো বুরসায় ছড়িয়ে পড়ল! লোকেরা ছদ্মবেশী বিনয়ী দরিদ্র এই ওলির প্রকৃত অবস্থা জানতে পারল। যিনি রুটির বিরাট খাঞ্চা পিঠে উঠিয়ে বুরসার অলি-গলিতে ঘুরে বিক্রি করতেন। শিশু-কিশোরদের সাথে খুনসুটি করতেন। তাদের ভালোবাসতেন। হৃদয় থেকে আদর করতেন। তারা জানতে পারল যে, তিনি একজন বড় আলেম। একজন খাঁটি আল্লাহর ওলি। তারা তাকে একনজর দেখে হাতে চুমু খাওয়া এবং দোয়া নেয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু তাদের সে আশা আর পূরণ হয়নি। তারা তাকে দেখতে পায়নি।

হ্যাঁ, সত্যিই খুৎবার পর তারা আর তাকে দেখতে পায়নি। তিনি খুৎবার পরপরই অন্য কোনো শহরে চলে গিয়েছিলেন, যেথায় লোকেরা তাকে চিনতে পারে না।

আল্লাহর ওলি 'হামিদ আকসর ইলি' ওরফে 'সমুঞ্জি বাবা' রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছিলেন 'আকসারাই' শহরে। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।[১৩]

---

১৩. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-২৮, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

Scanned by CamScanner

সুলতান ও ভাঁড়

১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দের কাহিনী। উসমানি খেলাফত উন্নতির জোয়ারে ভাসছে। খেলাফতের মসনদে তখন সমাসীন সুলতান প্রথম বায়েজিদ। যার উপাধি 'ইলদারম' বা 'বজ্রকড়ক'।

সুলতানের একটি অভ্যাস ছিল, তিনি রাজধানী বুরসার বাইরে যে এলাকা দিয়েই যাওয়া আসা করতেন, সেখানে কিছুসময় অবস্থান করে এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখ ও অভিযোগ-অনুযোগ শুনতেন। সাময়িক আদালত গঠন করে বিচার করতেন। এ আদালতকে 'আয়াক দেওয়ানি' বলা হতো।

এরকম একটি আদালতে তিনি বসে বিচার করছিলেন। ইত্যবসরে হঠাৎ করে একজন বৃদ্ধা আগমন করলেন। এসেই চিৎকার করে অভিযোগ করতে শুরু করলেন। সুলতান বৃদ্ধাকে কাছে ডেকে তার সমস্যার কথা স্পষ্ট করে বলতে বললেন। বৃদ্ধা বললেন,

-মহোদয় সুলতান! আপনার একজন কর্মকর্তা আমার উপর জুলুম করেছে!

-সে কী করেছে? আপনি সরাসরি বলুন। ভয়ের কিছু নেই।

-সে এসে আমার অনুমতি ব্যতিরেকে আমার দোহনকৃত দুধ পান করে নিয়েছে। কিন্তু আমি যখন তার কাছে দুধের মূল্য পরিশোধ করতে বললাম, সে আমায় বিরাট একটি চিৎকার দিয়ে ধমক দিল এবং গালাগালি করল! আমি মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি এলাকার কিছু মানুষের সাহায্যে ওই কর্মকর্তাকে পাকড়াও করে কাজির কাছে নিয়ে এলেন। কিন্তু জাঁহাপনা! কাজি ওই কর্মকর্তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে ছেড়ে দিয়েছেন! আমি নির্যাতিতা জাঁহাপনা! আমি আমার 'হক' চাই!

সুলতান ওই কর্মকর্তাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসার জন্য কিছু লোক পাঠালেন। তারা কর্মকর্তাকে ধরে সুলতানের দরবারে হাজির করল। ভয়ে কর্মকর্তা থরথর করে কাঁপছে!

সুলতান তাকে প্রশ্ন করলেন,

-তুমি কি এরকম এরকম করেছ?

ভয়ে কম্পমান কর্মকর্তা উত্তর দিল,

-আমাকে ক্ষমা করুন জাঁহাপনা! আমাকে শয়তান ধোঁকা দিয়ে ফেলেছিল! বৃদ্ধা মা যা চান, আমি তা দিয়ে দেব! কসম আল্লাহর! আমি এ ধরনের কাজ আর করব না জাঁহাপনা! আমাকে ক্ষমা করে দিন!

Scanned by CamScanner

তাহলে তো অভিযোগ সত্য। অপরাধীকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। আর শাস্তি দেয়ার মধ্যেই কি বিষয়টি শেষ? না, মোটেও না; বরং বিষয়টি সুলতানের কাছে আরও মারাত্মক মনে হল। সুলতান ভাবলেন, এরকম একটি বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কাজি কীভাবে খালাস দিয়ে দেয়; অথচ অভিযোগ প্রমাণিত! আবার সাক্ষীও বিদ্যমান! কীভাবে? তাহলে কি কাজি উৎকোচ গ্রহণ করেছে?

সুলতান তার সামনে নতশিরে দাঁড়ানো কম্পমান আসামির দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকানোর পর জিজ্ঞেস করলেন,

-তুমি কি কাজিকে ঘুষ দিয়েছিলে?

-না, হে জাঁহাপনা! আমি তাকে ঘুষ দেইনি। তবে আমি তাকে বলেছিলাম যে, আমি সুলতানের একজন কর্মকর্তা। তাই তিনি আমাকে ক্ষমা করে মুক্তি দিয়ে দিয়েছিলেন।

সুলতান রাগে দাঁতে দাঁত পিষে বললেন,

-যে মানুষের উপর জুলুম করে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করেন না। তার তাওবাও কবুল করেন না। তাহলে কাজি কীভাবে এই কর্মকর্তাকে মাফ করে দিল, অথচ সে একজন মানুষের উপর জুলুম করেছে! তোমরা যাও, ওই কাজিকে আমার কাছে নিয়ে এসো!

সুলতানের নির্দেশ শুনতেই কিছু লোক কাজিকে ধরে নিয়ে আসতে চলে গেল। সুলতান তার প্রধান দেহরক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললেন,

-তুমি তোমার লোকজনকে জড়ো করো। শহরের প্রতিটি ঘরের দরজায় করাঘাত করো আর প্রত্যেক এমন মজলুম মানুষের নাম রেজিস্ট্রি করো, যাদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে কাজি বা আদালতের বিরুদ্ধে। এরপর এসে আমাকে জানাও! আমার উপর অপরিহার্য হল, আমি ন্যায়-ইনসাফকে আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা করব।

প্রধান দেহরক্ষী কয়েক দিন পর সুলতানের সামনে একটি তালিকা পেশ করল—যাদের অভিযোগ রয়েছে কাজি বা আদালতের বিরুদ্ধে।

সুলতান তালিকায় নজর বুলাতেই এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কারণ, তালিকায় দু'চারজন নয়; বেশ কিছু মানুষের নাম বিদ্যমান! এরপর তোতলাতে তোতলাতে কোনোরকম বললেন,

-এটার অর্থ কি এই যে, আমরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি?

Scanned by CamScanner

রাজধানী বুরসায় পৌঁছেই সুলতান বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর ও শাসকদের প্রতি এই ফরমান জারি করলেন–

"আমি আপনাদের প্রতি এই অধ্যাদেশ জারি করছি, অতিসত্বর আপনারা আমার কাছে আপনাদের প্রতিটি গ্রাম, শহর কিংবা কেল্লার ওই কাজির নাম লিখে পাঠাবেন, যার ব্যাপারে শরিয়তের খেলাফ বা ঘুষ গ্রহণ করার অভিযোগ রয়েছে।"

সুলতানের রাগ দেখে উজিরে আজম জান্দারলি পাশা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাই অভিযুক্ত কাজিদের সুলতান কী শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করেছেন–তা জানতে চাইলেন।

সুলতান বললেন, ন্যায়নীতি দূর হয়ে যাওয়া মানে একটি সাম্রাজ্যের পতন ঘটা। আমি চাই অভিযুক্ত কাজিদের একটি ঘরে ঢুকিয়ে আগুন লাগিয়ে দেব!

সুলতানের এই জবাবটি উজিরে আজমের মাথায় যেন বজ্রাঘাত করল! অন্যান্য উজিরগণও কথাটি শুনে ভড়কে গেলেন। সকলেই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু কে এমন আছে, কঠিন প্রকৃতির এই সুলতানের সাথে তার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে?

হ্যাঁ, এখানে একজন লোক আছে, যে এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে সুলতানের সাথে কথা বলতে পারবে। সে হল রাজভাঁড়। তার কাজ হল রসিকতার মাধ্যমে সুলতানকে বিনোদিত করা। যার ভাঁড়ামি আর রসিকতায় সুলতান না হেসে পারেন না। কখন কীভাবে সুলতানকে হাসাতে হয়, খুব ভালোভাবেই সে জানে।

উজিরে আজম রাজভাঁড়কে ডেকে পাঠালেন। আসার পর তাকে বিষয়টির ভয়াবহতা খুলে বললেন। সব শুনে রাজভাঁড় বলল,

-হে পাশা! আপনি চিন্তিত হবেন না। বিষয়টি একেবারে সহজ।

পরদিন রাজভাঁড় সফরের কাপড়চোপড় পরে সুলতানের খাস কামরায় এসে উপস্থিত। তাকে দেখতেই সুলতান মুচকি হাসি দিলেন। তার পরনে সফরের কাপড় দেখে জিজ্ঞেস করলেন,

-কী ব্যাপার, তুমি কি কোথাও যাচ্ছো?

-হ্যাঁ জাঁহাপনা! সফরের অনুমতি নেয়ার জন্য আপনার দরবারে এসেছি আমি।

-কোথায় সফর করবে তুমি?

-বাইজেন্টায় জাঁহাপনা!

-সেখানে তুমি কী করবে?

Scanned by CamScanner

-আমি সেখান থেকে আনুমানিক একশ পাদ্রি ও যাজককে বুরসায় নিয়ে আসব!

ভ্রূ কুঞ্চিত করে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন,

-এতো পাদ্রি ও যাজক বুরসায় নিয়ে আসবে? এরা মুসলমানদের শহরে এসে কী করবে?

-তারা বিচারকার্য করবে জাঁহাপনা!

-তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? পাদ্রি ও যাজকরা কেন বিচারক হবে? আমাদের কাছে কি বিচারক নেই?

-এখানে তো কোনো বিচারক বাকি থাকবে না। বিচারকদের তো আপনি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন! মুসলমানদের বিচার-আচার তো আর বন্ধ থাকতে পারে না; তাই আমি তাদের দিয়ে বিচারকশূন্যতা পূরণ করতে চাই। যেভাবেই হোক, তারাও তো আলেম!

সুলতান হেসে ফেললেন। তিনি অনুভব করতে পারলেন, বিচারকদের ব্যাপারে তিনি কঠিন শাস্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সুলতান বললেন,

-ভালো! ভালো! আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসলাম। সম্ভবত আমি এ বিষয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। যেসকল উজিরগণ তোমায় আমার কাছে প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলো।

এরপর সুলতান প্রথম বায়েজিদ অভিযুক্ত বিচারকদের সমীচিন শাস্তি প্রদান করলেন।[১৪]

১৪. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-১১৬, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

প্রকৃত মুরিদ

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ (১৪০৩-১৪৫১)। সুলতান প্রথম মুহাম্মাদের সুযোগ্য সন্তান। সুলতান প্রথম বায়েজিদের নাতি। তিনি আল্লাহর ওলি 'হাজি বায়রাম'-কে খুবই ভালোবাসতেন। অত্যন্ত সম্মান করতেন। হাজি বায়রাম ছিলেন সে যুগের ওলামাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সুফি-দরবেশ। একজন দুনিয়াবিমুখ আল্লাহর ওলি। এই অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণেই সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ আঙ্কারাতে বসবাসকারী পীর হাজি বায়রামের সকল মুরিদের খাজনা রহিত করে দিলেন। তাদের জন্য সবধরনের খাজনা মাফ—এই ফরমান জারি করলেন।

খবরটি বিদ্যুৎবেগে 'আঙ্কারা' শহরে ছড়িয়ে পড়ল। খাজনা থেকে বাঁচার জন্য আঙ্কারার অধিবাসী প্রত্যেকেই নিজেকে পীর হাজি বায়রামের মুরিদ বলে দাবি করতে লাগল! আঙ্কারার খাজনা তহসিলদার খুবই বিপাকে পড়লেন। কীভাবে খাজনা আদায় করা যায়—এই ভেবে হয়রান হয়ে গেলেন!

এখন কী উপায়? এটা তো একেবারে অসম্ভব, পুরো শহরবাসী একজন পীরের মুরিদ হয়ে যাবে! আবার মিথ্যা দাবিদারদের থেকে সত্যিকার দাবিদারদের পৃথক করারও তো কোনো পন্থা নেই! এখন একটিমাত্র উপায় বাকি আছে। স্বয়ং সুলতানকে এ বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে অবহিত করতে হবে। তাকে বিষয়টি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করতে হবে এবং তার পক্ষ থেকে কী আদেশ আসে, তার অপেক্ষা করতে হবে।

আঙ্কারার প্রধান খাজনা তহসিলদার সুলতানের দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি তলব করলেন। অনুমতি দেয়া হলে তিনি সুলতানের সামনে গিয়ে বিনীতভাবে বললেন, 'জাঁহাপনা! আমরা আঙ্কারার অধিবাসীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে ব্যর্থ হচ্ছি। আমরা তাদের থেকে খাজনা আদায় করতে পারছি না!'

-কারণ কী? তারা কি খাজনা প্রদান করতে অস্বীকার করছে?
-মোটেও তা নয় জাঁহাপনা! তবে আপনার প্রিয় ওই ওলির মুরিদদের কাছ থেকে আপনি খাজনা আদায় না করার ফরমান জারি করেছেন।
-তা ঠিক। কিন্তু আমার আদেশের সাথে বর্তমান এই বিষয়টার কী সম্পর্ক?

Scanned by CamScanner

-জাঁহাপনা! আক্কারার সকল অধিবাসীই দাবি করছে যে, তারা ওই পীর সাহেবের মুরিদ!
-সকল অধিবাসীই?
-আজ্ঞে জাঁহাপনা!
-তোমরা কি এটা বিশ্বাস করে ফেলেছ?
-আমরা কখনও এটা বিশ্বাস করতে পারি না জাঁহাপনা! কিন্তু সমস্যা হল, আমরা কীভাবে সত্যিকার দাবিদারদেরকে মিথ্যা দাবিদার থেকে পৃথক করি?
-আচ্ছা! তাহলে তো বিষয়টা সত্যিই জটিল! আমি হাজি বায়রামের কাছে চিঠি লিখছি এ বিষয়ে। চিঠিতে আমি তার প্রকৃত মুরিদের সংখ্যা জানতে চাইব।

সুলতান একজন দূতের মাধ্যমে আক্কারায় হাজি বায়রাম সাহেবের কাছে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠি হস্তগত হওয়ার পর হাজি বায়রাম সুলতানের চিঠিটা পড়লেন। পড়ার পর মজলিসে তার ডান দিকে বসা কোনো একজন মুরিদকে বললেন,

'আমি চাই আগামি সপ্তাহেই আমার সকল মুরিদরা একটি ময়দানে জমা হোক। কেউ যেন বাদ না পড়ে।'
এরপর তিনি আগামী সপ্তাহের দিনক্ষণ ঠিকঠাক করে দিলেন। স্থানও নির্দিষ্ট করে দিলেন। ওই মুরিদ পুরো শহরে খবরটা পৌঁছে দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট ময়দানে আক্কারার প্রায় সকল অধিবাসী জমায়েত হয়ে গেল। সকলেই উৎসুক হয়ে আছে বিষয়টা কী–তা জানার জন্য! ময়দানে শুধুমাত্র একটি বিশাল তাবু টাঙানো ছিল। তা ছিল পীর হাজি বায়রাম সাহেবের। হাজি বায়রাম তাবু থেকে বের হয়ে উপস্থিত সবাইকে লক্ষ করে বললেন,
'যে আমার মুরিদ এবং আমাকে তার শায়খ হিসেবে মানে, সে যেন এগিয়ে এসে এই তাবুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আমি তাকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দেব এবং তার রক্ত তাবুর বাইরে প্রবাহিত করব; যাতে সকলেই তা দেখতে পায়।'
তার মুরিদদের মধ্য থেকে একজন যুবক এগিয়ে এসে বলল,
-আমি আছি হে শায়খ!
হাজি বায়রাম ওই যুবকের হাত ধরলেন। নিয়ে গেলেন তাবুর ভেতর। তাবুর ভেতরে একটি ছাগল জবাই করে তার রক্ত বাইরে প্রবাহিত করা হল। পুরো ময়দান জুড়ে উপস্থিত লোকদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে গেল! তারা

Scanned by CamScanner

একেবারেই ভড়কে গেল! তারা মনে করল, সত্যিই যুবককে ধরে নিয়ে তাবুর ভেতর জবাই করা হয়েছে!
হাজি বায়রাম তাবুর ভেতর থেকে বের হয়ে আবারো আগের মতো হাঁক ছুড়লেন–
-আছো কি কেউ এগিয়ে আসবে? আমি আরেকজন মুরিদ চাচ্ছি।
-আমি আছি হে শায়খ! এ কথাটি বলে আরেকজন খাঁটি মুরিদ যুবক এগিয়ে এল। তাকে নিয়েও শায়খ তাবুর ভেতর ঢুকে গেলেন। এবারও আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। অবস্থার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে উপস্থিত লোকদের গলার পানি শুকিয়ে গেল! আস্তে আস্তে মাঠ ফাঁকা হতে শুরু করল! তিনি আবারো হাঁক দিলেন–
-আর কোনো মুরিদ আছো?
-আমি আছি হে শায়খ! এই বলে আরেকজন মহিলা মুরিদা এগিয়ে এল।
এবারো আগের মতো ঘটনাই ঘটল।
-আর কোনো মুরিদ আছো?

এবার সকলেই নিশ্চুপ! এগিয়ে আসার মতো কেউ নেই! সাড়া দেবার মতো কারোরই অবস্থা বাকি নেই। ভয়ে সকলেরই অবস্থা মৃগী রোগীর মতো! তাবুর বাইরে প্রবাহিত রক্তের জোয়ার দেখে সকলেরই মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা।
ওইদিনই হাজি বায়রাম সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের কাছে জবাবি চিঠি প্রেরণ করলেন। চিঠিতে তিনি লিখলেন,
"আঙ্কারায় আমার প্রকৃত মুরিদের সংখ্যা মাত্র তিনজন। দুজন পুরুষ আর একজন মহিলা!"[১৫]

---

১৫. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-৩৭, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

Scanned by CamScanner

আমাদের শহরগুলোও শাসন করুন

সালজুকি সাম্রাজ্যের পতনের পর গঠিত হওয়া আনাতোলিয়ার কতিপয় রাজ্য উসমানি খেলাফতের শাসনের বাইরে রয়ে গিয়েছিল। উসমানিরা সেই রাজ্যগুলোকেও উসমানি শাসনের আওতাধীন করার ইচ্ছা করলেন। আর তা উসমানি খেলাফতের ঐক্যের স্বার্থেই। সেসব রাজ্যগুলোর একটি ছিল সালজুকি সাম্রাজ্যের রাজধানী 'কুনিহ'।

সুলতান প্রথম বায়েজিদ কুনিহকে খেলাফতের শাসনাধীন করার জন্য যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কুনিহের ফটকে পৌঁছলেন, তখন ছিল ফসল কাটার মওসুম। গম-যবের রাশি রাশি স্তূপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিলো কুনিহের উপত্যকায়। উসমানি সেনাদলের আগমন টের পেয়ে তারা ভয়ে কুনিহের দূর্গে আশ্রয় নিয়ে ফটক বন্ধ করে দিয়েছিল।

উসমানি সেনাদলের ঘোড়ার খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়েছিল। সুলতান প্রথম বায়েজিদ সেনাবাহিনীকে আদেশ করলেন, 'যাও! তোমরা দূর্গের প্রাচীরের নিচে গিয়ে আওয়াজ করো–হে দূর্গবাসী! আপনারা নিচে নেমে আসুন। আমাদের ঘোড়ার দানাপানির জন্য আমরা আপনাদের গম-যব খরিদ করব।'

সুলতানের আদেশানুযায়ী সেনাবাহিনী দূর্গবাসীকে এই খবর পৌঁছে দিল। আওয়াজ শুনে কিছু লোক দূর্গ থেকে নিচে নেমে আসল। তারা উসমানি সেনাবাহিনীর কাছে গেলো একথা জানার জন্য–উসমানিরা যা বলছে তা সত্য কি না!

সুলতান যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, সেনাবাহিনীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, 'দেখো! এরা তোমাদের দ্বীনি ভাই-বেরাদর। তাদের উপর জুলুম করা থেকে নিজেদের সামলিয়ে রাখবে। তাদের হকের বিবেচনা করবে। তাদের থেকে গম-যব খরিদ করবে তাদের চাহিদামত মূল্যের বিনিময়ে।'

সেনারা সুলতানের আদেশে তাই করল। যারা দূর্গ থেকে নিচে নেমে এসেছিল, তারা তাদের চাহিদামত মূল্য পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে দূর্গে ফিরল!

দূর্গবাসী তাদের কাছ থেকে অন্তর প্রশান্তকারী এই ন্যায়নীতি আর মানবতার কথা জানতে পেরে দূর্গের প্রধান ফটক খুলে দিল। উসমানিদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে দূর্গের ভেতর বরণ করে নিল। এই খবরটা যখন আশপাশের শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল, তখন শহরগুলোর বাসিন্দারাও উসমানিদেরকে দাওয়াত করে বলতে লাগল, 'আসুন! আমাদের শহরগুলোও শাসন করুন!'[১৬]

---

১৬. খাওয়াতিরু উসমানিয়্যাহ-৫৪। আবদুল করিম ইজ্জুদ্দিন।

Scanned by CamScanner

আমাদের শহরকে আপনার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করুন

সুলতান প্রথম বায়েজিদ 'তৈমুর লঙ'-এর সাথে আঙ্কারার যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি হয়ে শাহাদাত বরণ করার পর আনাতোলিয়ায় গোলযোগ আর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দিল। এ সুযোগ গ্রহণ করল ভেনেজিয়ার শাসকগণ। তার 'সালানিক' শহর দখল করে নিল।

এ অস্থিতিশীলতা ও গোলযোগ ধারাবাহিকভাবে লেগেই থাকল। আনাতোলিয়া হয়ে ওঠল অরাজকতার এক স্বর্গরাজ্য। শেষ পর্যন্ত এই অরাজকতা দমন করার জন্য হিম্মত করে দাঁড়ালেন সুলতান প্রথম বায়েজিদের সুযোগ্য সন্তান প্রথম মুহাম্মাদ (১৪১৩-১৪২১)। তিনি অস্থিতিশীলতা আর অরাজকতাকে কঠোর হস্তে দমন করলেন। আনাতোলিয়ায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ছোটছোট রাজ্যগুলোকে খতম করে দিলেন। সবগুলোকে আবারো উসমানি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

কিন্তু সুলতান প্রথম মুহাম্মাদ সালানিক শহর উদ্ধার করতে পারলেন না। কারণ, তিনি উসমানি সালতানাতকে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। নতুনভাবে উসমানি সালতানাতকে প্রতিষ্ঠা করতে মগ্ন ছিলেন।

কিন্তু পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ (১৪০৩-১৪৫১) 'সালানিক' শহরের কথা ভুলেননি। তিনি সালানিক শহরটি সহজভাবে আবারো ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। তিনি ভেনিজিয়ার শাসকদের কাছে উপহার-উপঢৌকন পাঠিয়ে সালানিক শহর ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বলতে থাকলেন। ভেনিজিয়ার শাসকরাও প্রতিনিধি প্রেরণ করে টালবাহানা আর কালক্ষেপণ করতে থাকল। কিন্তু যখন সুলতান প্রথম মুরাদের ধৈর্যের পেয়ালা ফুরিয়ে এলো, তখন তার কাছে আগত সর্বশেষ প্রতিনিধিদলের প্রধানকে শাসিয়ে দিয়ে বলে দিলেন–

> 'আমাদের পূর্বপুরুষরা সালানিক শহর বিজয় করেছিলেন। এভাবে সালানিক একটি ইসলামি শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই আমরা সালানিক শহরে কোনো ভিনজাতির কর্তৃত্ব বা দখল মেনে নিতে পারব না। যদি আপনারা ভালোয় ভালোয় শহর ফিরিয়ে না দেন

Scanned by CamScanner

এবং নিরাপেদ সরে না যান, তাহলে আমি এসে জোরপূর্বক আপনাদের সেখান থেকে বের দেব!'

সুলতান কয়েক মাস অপেক্ষা করলেন। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে যখন কোনো জবাব আসলো না তখন ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সমুদ্রপথে নৌ-হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেললেন। তার নৌবাহিনী 'গ্যালিবুলি'র কাছে ভেনিজিয়ার নৌবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুপক্ষকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করল উসমানি নৌবাহিনী। এরপর তিনি সালানিক শহরে প্রবেশ করলেন। এখানেও বাঁধার সম্মুখীন হলে যুদ্ধ বেঁধে যায়। উভয় পক্ষে রক্তাক্ত লড়াই সংঘটিত হল। অবশেষে হকের বিজয় হয়। সুলতান বাহিনী নিয়ে বিজয়ী বেশে শহরে প্রবেশ করলেন।

যখন সুলতান মুরাদ সালানিক শহরে অবস্থান করছিলেন, তখন তার লোকেরা অবহিত করল, ইয়ানি শহরের একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত হয়েছে। তারা কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুলতানের সামনে আসতে চায়। খবরটি শুনে সুলতান আশ্চর্য হলেন! কারণ, ইয়ানি শহরের সাথে সুলতানের কোনো যোগসূত্রই ছিল না। এই শহরটি ইটালির শাসনাধীন ছিল।

ঐতিহাসিক সূত্রমতে, ইয়ানি শহর ছিল ইটালির 'টুকো' রাজপরিবারের শাসনাধীন। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে যখন প্রথম কার্ল টুকো মৃত্যুবরণ করেন, মসনদে আরোহণ করেন তার ভাতিজা 'দ্বিতীয় কার্ল টুকো'। কিন্তু 'প্রথম কার্ল টুকো'র সন্তানরা বিদ্রোহ করে বসল। তারা পিতার উত্তরাধিকারের দাবি করে বসল। 'টুকো রাজতন্ত্রে' বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা সৃষ্টি হয়ে গেল। এ অবস্থায় যখন 'ইয়ানি' শহরের লোকজন শুনতে পেল, তাদের পার্শ্ববর্তী সালানিক শহরে উসমানি সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ অবস্থান করছেন, তখন তারা তাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করল।

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ তার দেহরক্ষী প্রধানকে প্রতিনিধিদল প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন।

তাদেরকে দো-ভাষীর মাধ্যমে স্বাগতম জানিয়ে বললেন,
-কী উদ্দেশে আপনারা আগমন করলেন? আপনারা কী চান?
প্রতিনিধিদলের প্রধান বলল,
-'মহামান্য সুলতান! আমরা আপনার সাহায্য কামনা করতে এসেছি। সুতরাং আপনি আমাদের আশা ভঙ্গ করবেন না।

Scanned by CamScanner

-আমি কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?

-জাঁহাপনা! আমাদের শাসকরা আমাদের উপর জুলুম করে। আমাদের সাথে দাসের মতো ব্যবহার করে। এরপর আমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে গিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

-কিন্তু আমি আপনাদের জন্য কী করতে পারি? এটা তো আপনাদের ও আপনাদের শাসকদের মধ্যকার সমস্যা।

-জাঁহাপনা! আমরা মুসলিম নয়; আমরা খ্রিস্টান। কিন্তু আমরা মুসলিমদের ন্যায়পরায়ণতার কথা অনেক শুনেছি। মুসলমানরা নাকি তাদের প্রজাদের উপর জুলুম করে না। তারা প্রজাদেরকে ধর্মান্তরিত করার জন্য বলপ্রয়োগ করে না। তাদের কাছে প্রত্যেকের অধিকার আলাদা এবং তা নিশ্চিত। এ কথাগুলো আপনাদের দেশে গমনকারী আমাদের দেশের পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শুনতে পেরেছি। এজন্য আমরা চাই যে, আপনি আমাদেরকে আপনার সুনজরে রাখেন। আপনার অধীনে নিয়ে যান। আমাদের শহরকে আপনার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন আর আমাদেরকে জালিম শাসকদের জুলুম থেকে বাঁচান।

এরপর তারা সুলতানের দিকে ইয়ানি শহরের স্বর্ণখচিত চাবি বাড়িয়ে দিল।

সুলতান ইয়ানি শহরের প্রতিনিধিদলের ডাকে সাড়া দিলেন। একজন দক্ষ কমান্ডারকে ইয়ানি শহরের সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করলেন। এভাবেই কার্যত ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দে ইয়ানি শহর বিজিত হয়ে যায়।

এটা কোন অলীক কল্পকাহিনী নয়; এক ঐতিহাসিক সত্য কাহিনী। মুসলিমদের সততা আর ন্যায়পরায়ণতার এক অন্যতম নজির।[১৭]

---

১৭. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-৩৩, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

গোলাম থেকে শায়খুল ইসলাম

'মোল্লা আবদুল করিম আফেন্দি' (মৃত্যু-১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ)। গোলাম থেকে তিনি হয়ে যান একজন বড় আলেম! উসমানি খেলাফতের ষষ্ঠ শায়খুল ইসলাম। তার জন্মস্থান আলবেনিয়ার আরনাউত। পুরো নাম মোল্লা আবদুল করিম বিন আবদুল্লাহ আর রুমি আল হানাফি।

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের নামকরা আমির মুহাম্মাদ আগা খান মোল্লা আবদুল করিম, মাহমুদ পাশা ও মোল্লা ইয়াসকে ছোটবেলায় গোলাম হিসেবে খরিদ করে আনেন। পরে মাহমুদ পাশা ও মোল্লা ইয়াসকে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে মাহমুদ পাশা উজিরে আজম হয়ে যান আর মোল্লা ইয়াস শাহজাদা মুহাম্মাদ আলফাতিহের শিক্ষক হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন।

আমির মুহাম্মাদ আগা খান মোল্লা আবদুল করিমকে নিজের কাছে রেখে তার জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ করেন। তিনি একের পর এক বিভিন্ন ইসলামি শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করতে লাগলেন। অসাধারণ প্রতিভা আর প্রখর মেধার গুণে অল্পদিনেই তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তৎকালীন সময়ের নামকরা আলেম মোল্লা আলি তুসি ও মোল্লা সিনান আজমির কাছেও ইলম হাসিল করেন। পরে বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ কনস্টান্টিনোপল বিজয় করার পর সেখানে একটি বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিও সেখানে শিক্ষাদান করেন। ১৪৫৯ সালে সেনাবাহিনীর বিচারক নিযুক্ত হন। পরে 'মোল্লা কুরানি'র মৃত্যুর পর ১৪৮৮ সালে শায়খুল ইসলাম পদে অধিষ্ঠিত হন।

আল্লামা তাশকুবরা জাদাহ রাহ. 'আশ-শাকাইকুন নুমানিয়াহ' নামক গ্রন্থে লিখেন–

মোল্লা উইলদান উজিরে আজম মাহমুদ পাশাকে বলেন,
-আমি আপনাকে খুবই ভালোবাসি। অথচ আপনি মোল্লা আবদুল করিম আফেন্দিকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন!
-হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন।
-মোল্লা আবদুল করিম কি তার সাথে আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন?
-আমি এরকমই আশা রাখি।

Scanned by CamScanner

-কীভাবে?

-আমি আমির মুহাম্মাদ আগা খানের প্রাসাদের প্রধান প্রহরী ছিলাম। আমার মদপানের বদঅভ্যাস ছিল। একরাতে আমি অভ্যাসের তুলনায় একটু বেশিই মদ পান করেছিলাম। রাতভর নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে রইলাম। ফজরের দিকে আমার দরজায় এসে করাঘাত করলেন মোল্লা আবদুল করিম আফেন্দি। আমি তার উপস্থিতি টের পেয়ে তড়িঘড়ি মদের বোতলগুলো লুকিয়ে ফেললাম। ঘরটাকে পবিত্র করে নিলাম। পুরো ঘরে সুগন্ধি ছিটিয়ে দিলাম; যাতে তিনি ব্যাপারটা আঁচ করতে না পারেন। এরপর দরজা খুলে দিলাম।

তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ তার সাথে আলাপ করলাম। অতঃপর যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। দরজার কাছে গিয়ে আবারো ফিরে আসলেন। আমাকে বললেন,

-মাহমুদ পাশা! আপনাকে কিছু কথা বলতে চাই।

-জি, বলুন!

-মাশাআল্লাহ! আপনি তো যথেষ্ট দ্বীনি জ্ঞান রাখেন। আবার অচিরেই উজির হতে যাচ্ছেন। সুতরাং কেন এই নাপাকিটা পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে ভেতরটা নাপাক করছেন?

কথাটা শোনার সাথে সাথে লজ্জায় আমার মস্তক অবনত হয়ে আসলো। আমার দেহ থেকে ঘাম দরদর করে ঝরে পড়তে লাগল। অথচ তখন শীতের মওসুম চলছিল! সেদিন থেকেই আমি মদপান ছেড়ে দিয়েছিলাম। মোল্লা আবদুল করিম আফেন্দি ছিলেন আমার তওবার উসিলা।[১৮]

---

১৮. তারিখু মুআসসাতি শুয়ুখিল ইসলাম ফিদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ-১/৪৪৫, আহমদ সাদকি শাকিরাত। *আশ শাকাইকুন নুমানিয়্যাহ ফি উলামাইদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ-৯৫, আল্লামা তাশকুবরা জাদাহ।

Scanned by CamScanner

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের অসিয়ত

পুরো কামরা জুড়ে শোকের ছায়া ছেয়ে আছে। পিনপতন নীরবতা বিরাজমান। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ শয্যাশায়ী। মৃত্যুযাতনায় কাতরাচ্ছেন। রাজদরবারের সবাই তাকে বেষ্টন করে অস্ফুট স্বরে নীরব মাতম করে চলছেন। সুলতানের প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত। সকলেই সুলতানের দুটো ঠোঁট নড়ে ওঠার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ! শেষমেশ সুলতান কী অসিয়ত করে যান–তা শোনার জন্য। সুলতানের মুদিত চোখের পাপড়িগুলো মৃদু নড়ে উঠল। আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুলে ক্ষীণদৃষ্টিতে উজির ইসহাক পাশাকে খুঁজতে লাগলেন। মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগলেন,

'পড়ো হে ইসহাক! আমার অসিয়ত পড়ো!'

সুলতানের আদেশে উজির ইসহাক পাশা দরাজ কণ্ঠে অসিয়তনামা পড়ে শোনাতে লাগলেন–

> "পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর, যিনি গোটা জাহানের পালনকারী। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় হজরত মুহাম্মাদ এবং তার পরিবারবর্গ ও সাথীদের প্রতি। আমি মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করলাম।
>
> প্রতিটি প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনকারী। সুতরাং তোমাদের যেন পার্থিব জীবন ধোঁকায় না ফেলে এবং কোনো ধোঁকাদানকারী যেন তোমাদের ধোঁকা না দেয়...
>
> অতঃপর, তোমরা আমার মালিকানাধীন সম্পদের এক তৃতীয়াংশ 'সারুহান' প্রদেশে বণ্টন করবে। বাকি সম্পদের ৩৫০০ স্বর্ণখণ্ড মক্কার দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করবে। অনুরূপ ৩৫০০ স্বর্ণখণ্ড মদিনার দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করবে। ৫০০ স্বর্ণখণ্ড মক্কার যেসকল অধিবাসী হারাম শরিফে বেশিবেশি কুরআন তেলাওয়াত করবে এবং সত্তর হাজারবার কালিমা তাইয়েবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে এর সওয়াব অসিয়তকারীর কবরে হাদিয়াস্বরূপ পৌঁছিয়ে দেবে–তাদের মাঝে বিলি করে দেবে। আমার এই সম্পদ থেকেই ২৫০০ স্বর্ণখণ্ড তাদের মাঝে বণ্টন করে দেবে, যারা

Scanned by CamScanner

বাইতুল মাকদিসের গম্বুজের নিচের প্রশস্ত আঙিনায় বসে বেশিবেশি করে কুরআন তেলাওয়াত করবে এবং সত্তর হাজারবার কালিমা তাইয়েবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে এর সওয়াব অসিয়তকারীর কবরে হাদিয়াস্বরূপ পৌঁছিয়ে দেবে।"

গভীর দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে, সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের এই অসিয়তনামা সম্পূর্ণ এক নিখাঁদ রাসুলপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ। কারণ, তখনকার সময়ে মক্কা, মদিনা ও কুদস উসমানি সালতানাতের অধীনে ছিল না। তবুও অন্তিম মুহূর্তে এই ভূমি ও ভূমিগুলোর মানুষের প্রতি অন্তরের গভীরে লালিত আবেগ আর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করে গেছেন অসিয়তনামার মাধ্যমে।[১৯]

১৯. মাজাল্লাতু হেরা, সংখ্যা-১৮, তুরস্ক হতে প্রকাশিত। *রাওয়াইয়ু মিন তারিখি ওয়া আমজাদিনাল মুসলিমিন (ফেইসবুক পেইজ)।

আসামির কাঠগড়ায় সুলতান

সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ (১৪৫১-১৪৮১)। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের সুযোগ্য সন্তান। সুলতান প্রথম মুহাম্মাদের নাতি। কনস্টান্টিনোপল বিজেতা মুসলিম মহানায়ক। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর তাকে 'ফাতিহ' বা 'বিজয়ী' উপাধি দেয়া হয়। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস "অবশ্যই কনস্টান্টিনোপল বিজয় করা হবে। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী সেনাপতি কতোই-না উত্তম এবং সে সেনাদলও কতোই-না উত্তম!"-এর ভাষ্যমতে তিনিই সেই বিজয়ী সেনাপতি। সে হিসেবে ইতিহাসে তিনি 'সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ' নামে পরিচিত।

একবার সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ উসমানি খেলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুলে একটি জামে মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা করলেন। এ কাজের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব অর্পণ করলেন এক ইটালিয়ান স্থাপত্যবিদের কাছে। নাম এবসলান্টি। সে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। সুলতান আদেশ করলেন, মসজিদের খুঁটিগুলো যেন উঁচু হয়, যাতে দূরে থেকে মসজিদকে গগনচুম্বী মনে হয়। সাথে উচ্চতার সীমারেখাও নির্ধারণ কিরে দিলেন।

কিন্তু এবসলান্টি কোনো এক কারণে সুলতান বা অন্য কারও সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকেই খুঁটিগুলো খাটো করতে অধীনস্ত নির্মাণ শ্রমিকদের নির্দেশ দিয়ে বসলো। সুলতান যখন এ ব্যাপারে অবহিত হলেন, রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। কারণ, প্রচুর ব্যয় করে খুঁটিগুলো অনেক দূর থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

সুলতান এতোটাই রাগান্বিত হলেন যে, এবসলান্টির হাত কেটে ফেলার ফরমান জারি করলেন! কিন্তু পরে নিজের ভুলও বুঝতে পারলেন। অনুতপ্ত হলেন। কিন্তু সেই অনুতাপ কোনো কাজে আসল না! কাজ যা হবার হয়েই গেছে ইতিমধ্যে। মিস্ত্রির কব্জি হাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে!

স্থাপত্যবিদ এবসলান্টিও বসে থাকেনি। নিজের বিচার পাওয়ার জন্য ইস্তাম্বুলের কাজি 'সারি খিজির চলপি'র দরবারে ছুটল। যার ন্যায়পরায়ণতা উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিরাজমান। কাজির দরবারে গিয়ে সরাসরি সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল!

কাজি কালক্ষেপণ না করে সুলতানকে ডেকে পাঠালেন আসামির কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করার জন্যে। কারণ, স্বয়ং রাজার বিরুদ্ধে প্রজার অভিযোগ পাওয়া গেছে! সুলতানও খবর পেয়ে কালবিলম্ব না করে উপস্থিত

Scanned by CamScanner

হলেন কাজির দরবারে। কারণ, সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা একজন সুলতানের চেয়েও বড়।

নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হলেন সুলতান কাজির সামনে। বসার জন্য উপগত হলেন আদালতের বেঞ্চে। কাজি বাঁধা দিয়ে বললেন,

-'জাঁহাপনা! আপনার জন্য বসা সমীচিন নয়; বাদীর কাছে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আপনার জন্য অপরিহার্য।'

সুলতান বাদীর কাছেই কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন বিবাদী হয়ে। বাদী তার অভিযোগ দায়ের করল। এরপর এলো সুলতানের পালা। সুলতান নিজের জবানবন্দি পেশ করলেন। জবানবন্দিতে বাদীর অভিযোগ মাথা পেতে মেনে নিলেন। অতঃপর ফয়সালা শোনার জন্য ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কাজির দিকে।

কাজি কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে নীরব রইলেন। এরপর মস্তক উত্তোলন করে ফয়সালা শোনালেন–

"ইসলামি শরিয়াহর নীতিমালা অনুযায়ী 'কিসাস' হিসেবে আপনার হাত কর্তন করে দিতে হবে হে জাঁহাপনা!"

ফয়সালা শুনে বাদী একেবারে ভড়কে গেল! কাজির মুখ নিঃসৃত এই বাক্য শুনে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল! কারণ, এ ধরনের ফয়সালা তার কল্পনাজগতেও ছিল না! তার ধারণা ছিল যে, কাজি তার জন্য হয়ত বেশির চে' বেশি আর্থিক বিনিময়ের ফয়সালা করে দিবেন। কিন্তু হাত কর্তন! স্বয়ং সুলতানের! কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের! যার ভয়ে ইউরোপের শাসকরা থরথর করে কাঁপে–এসব ছিল তার কল্পনারও ঊর্ধ্বে!

হতভম্ব স্বরে তোতলাতে তোতলাতে সে কাজির দরবারে আরজ করল, সে তার অভিযোগ ফিরিয়ে নিয়েছে। সে কাজির কাছে ফয়সালা হিসেবে আর্থিক বিনিময়েরই আশা রাখে। সুলতানের হাত কর্তন তার কোনো উপকারে আসবে না।

কাজি তার জন্য কর্তিত হাতের ক্ষতিপূরণ হিসেবে জীবনভর দৈনিক 'দশ কিতা' (তুর্কি মুদ্রা) জরিমানা সাব্যস্ত করলেন। কিন্তু সুলতান সাব্যস্ত করলেন 'বিশ কিতা'! এই দ্বিগুণ মুদ্রা 'কিসাস' হিসেবে হাত কর্তন থেকে মুক্তি দেয়ার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ! নিজ ভুলের মাশুল। নিজ অনুতাপের দৃষ্টান্ত।[২০]

---

২০. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-৪৯, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

শায়খ আক শামসুদ্দিনের আত্মসম্ভ্রমবোধ

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ তার উস্তাদ 'শায়খ আক শামসুদ্দিন'-কে খুবই ভালোবাসতেন। অত্যন্ত সম্মান করতেন। নিয়মিত তার খানকায় গিয়ে দেখা করতেন। সেখানে তার ওয়াজ-নসিহত শুনতেন। তার ইলম থেকে উপকৃত হতেন।

সুলতানের উস্তাদ 'শায়খ আক শামসুদ্দিন' ছিলেন খুবই আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন একজন গুরুগম্ভীর আলেম। আল্লাহ ছাড়া কাউকে পরোয়া করতেন না। সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ যখন তার খানকায় আগমন করতেন, তিনি আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে সম্মান করতেন না। কিন্তু যখন তিনি সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের রাজদরবারে গমন করতেন, তখন স্বয়ং সুলতান মসনদ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান করতেন এবং হাতে ধরে নিয়ে পাশে বসাতেন। সুলতানের মন্ত্রী এবং দরবারের লোকজন বিষয়টা খেয়াল করলেন। তাই একদিন উজিরে আজম মাহমুদ পাশা আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

-আমি জানি না হে মহামান্য সুলতান! 'শায়খ আক শামসুদ্দিন' আপনার দরবারে তাশরিফ নিয়ে আসলে আপনি কেন তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যান আর অন্য কোনো আলেম বা শায়খ আসলে আপনি তাদের সম্মানার্থে দাঁড়ান না! আবার আপনি যখন আপনার উস্তাদের খানকায় যান, তখন তিনি তো আপনার সম্মানার্থে দাঁড়ান না!

-আমিও এর কারণ কী—জানি না! তবে যখন আমার উস্তাদ 'শায়খ আক শামসুদ্দিন'-কে আমার দরবারে আগমন করতে দেখি, আমি আমাকে সামলাতে পারি না। কেন জানি আমি দাঁড়াতে বাধ্য হই! কিন্তু অন্য কোনো আলেম বা শায়খ আমার দরবারে আসলে আমি তাদেরকে দেখি, তারা আমার উপস্থিতিতে ভয়ে কাঁপেন! জড়তাযুক্ত ভাষায় আমার সাথে কথা বলেন!

অপরদিকে আমি যখন 'শায়খ আক শামসুদ্দিন'র খানকায় গিয়ে তার সাথে কথা বলি, আমি অনুভব করি যে, আমি জড়তাগ্রস্ত হয়ে আমার কথাগুলো তালগোল পাকিয়ে নিচ্ছি![২১]

---

২১. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-৪৮, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

Scanned by CamScanner

জাকাতের থলে ঝুলে বৃক্ষের ডালে

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ। উসমানি খেলাফতের প্রতাপশালী শাসক। রাষ্ট্রপরিচালনা, ন্যায়পরায়ণতা, আইন-শৃঙ্খলা, নাগরিক অধিকার আর সুষ্ঠু বিচারে ছিলেন প্রবাদপুরুষ। তার শাসনকাল উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহ.'র সোনালি যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

তার শাসনামলে এক ব্যক্তি জাকাত আদায় করার ইচ্ছা করে। কিন্তু জাকাত দেয়ার উপযোগী কোনো লোক খুঁজে পায়নি! অবশেষে সে জাকাতের মালকে একটি থলের মধ্যে রেখে উপরে লিখে রাখল–

"হে আমার ভাই! এটা আমার জাকাতের মাল। আমি জাকাত দেয়ার উপযোগী কোনো মানুষ পাইনি। যদি তুমি এই মালের হকদার হয়ে থাকো, তাহলে নির্দ্বিধায় এই মাল নিতে পারো।"

এরপর সে এই থলেকে শহরের একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল। আশ্চর্যের বিষয় হল, থলেটি ওই গাছের ডালে তিনমাস পর্যন্ত ঝুলে ছিল, কেউ গ্রহণ করেনি![২২]

২২. মানহালুজ জামআন লি-ইনসাফি দাওলাতি আলে উসমান-৬৭, মুহাম্মাদ উসামা জায়েদ।

নরপিশাচ ড্রাকুলার পরিণতি

'ড্রাকুলা' শব্দটি শুনতেই আমাদের চোখের সামনে এক রক্তখেকো ডাকু বা দস্যুর প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। আমরা অনেকেই মনে করি এটি রূপকথার কোনো নাম। আমাদের এ মনমানসিকতা তৈরি করেছে ড্রামা-সিনেমা। কিন্তু 'ড্রাকুলা' একটি বাস্তবিক নাম। রোমান সম্রাট 'তৃতীয় ফ্লাড'র উপাধি। যাকে অনেকেই রোমান বীর বলে গণ্য করে। তারা মনে করে যে, সে রোমান সাম্রাজ্যকে উসমানি সালতানাতের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু সত্য হল, এই 'ড্রাকুলা' ছিল এক রক্তখেকো পিশাচ শাসক। তার জুলুম-নির্যাতন, রক্তপাত ও পৈশাচিক পন্থায় হত্যার কালো অধ্যায় এখনও ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান।

উসমানি সুলতান প্রথম মুহাম্মাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর রুমানিয়া রাষ্ট্রকে নতজানু করতে সক্ষম হন। তাদেরকে বার্ষিক কর দিতে বাধ্য করেন। রুমানিয়া উসমানি খেলাফতের নেতৃত্বকেও স্বীকার করতে বাধ্য হয় হামলা থেকে নিজেকে বাঁচাতে। বস্তুত সে সময় থেকেই রুমানিয়া উসমানি খেলাফতের একটি বন্ধুপ্রতিম দেশ বলে বিবেচিত হয়।

সুলতান প্রথম মুহাম্মাদের সাথে চুক্তি হওয়ার পর কালের পরিক্রিমায় ড্রাকুলার পিতা 'দ্বিতীয় ফ্লাড' উসমানি খেলাফতের বিরুদ্ধে ইউরোপের ক্রুসেডারদের সাথে আঁতাত করতে শুরু করে। উসমানি সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। যুদ্ধে পরাজিত করলেন। যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর দ্বিতীয় ফ্লাডকে বার্ষিক কর দিতে চুক্তিবদ্ধ করেন। চুক্তির মধ্যে এটাও ছিল-"সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ রুমানিয়ান সম্রাট 'দ্বিতীয় ফ্লাড'র দুই সন্তান 'তৃতীয় ফ্লাড' (ড্রাকুলা) ও রাউলকে উসমানি সালতানাতের হেরেমে নিয়ে এসে লালন-পালন করবেন। এই শর্ত ছিল চুক্তি মজবুত করার জন্য"।

তৃতীয় 'ফ্লাড' (ড্রাকুলা) এর পিতা রুমানিয়ান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্লাডের নিহত হবার পর ১৪৪৭ সালে উসমানিরা ড্রাকুলাকে ছেড়ে দেন। ছাড়া পাওয়ার পর সে পিতার ক্ষমতা উদ্ধারের চেষ্টা করতে থাকে। আর তার ভাই 'রাউল' সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের অধীনে উসমানি সালতানাতের হেরেমে বড় হতে থাকে।

কয়েক বছর যেতে না যেতেই ড্রাকুলা ১৪৫৬ সালে উসমানিদের সহায়তায় রুমানিয়ার ক্ষমতা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ক্ষমতা পাবার পরপরই সে

বদলে যায়। উসমানি সালতানাতের অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ ভুলে বসে। তার ভেতরের সুপ্ত ক্রুসেডীয় হিংসা জেগে ওঠে। ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। উসমানি সালতানাত ও সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়।

ড্রাকুলা রুমানিয়ার ক্ষমতা হাতে নেয়ার পর শুরু করে তার পৈশাচিক শাসনের নবঅধ্যায়। সে মানুষকে হত্যা করে টুকরো টুকরো করে নাক, কান, হাত-পা কেটে নিত। পুড়িয়ে দিত। কড়াইয়ের মধ্যে তেল গরম করে একেবারে ভুনা করে ফেলত! মাথায় হাতুড়ি দিয়ে লোহার পেরেক বিদ্ধ করে মারত! বন্দিদের কুঠুরিতে হিংস্র প্রাণী ঢুকিয়ে দিয়ে হত্যা করাত!

সে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। সংগঠনের লগো ছিল 'তিন্নিন' নামক এক অদ্ভুত প্রাণীর। সবসময় তার মাথায় রক্তের নেশা খেলা করত। সে তার মহলে বিভিন্ন পশু-প্রাণীকে আটকে রেখে পৈশাচিক কায়দায় নির্যাতন করত। অবশেষে হত্যা করত। তার বসবাসের মহলটি হয়ে গিয়েছিল ভীতিসঞ্চারক ও লোমহর্ষক!

ড্রাকুলাকে তার প্রজারা 'মুখওয়াজ্জিক' উপাধি দিয়েছিল। 'খাজুক' এর দিকে সম্বন্ধ করে দিয়েছিল এই উপাধি। খাজুক হল ধারালো অগ্রভাগওয়ালা এক লাকড়ির টুকরো। খুবই পৈশাচিক পন্থায় খাজুক দিয়ে মানুষদের হত্যা করত। খাজুক এর মধ্যে গরম তেল মাখিয়ে বন্দিদের দেহের পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে ঢুকিয়ে অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়ে অবশেষে হত্যা করত। এমনকি সে ছোট্ট শিশুদেরকে পর্যন্ত তাদের মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে খাজুক দিয়ে হত্যা করত!

ড্রাকুলা একটি মুসলিম শহরে হামলা করল। পঁচিশ হাজার মুসলিমকে বন্দি করে নিয়ে খাজুক দিয়ে হত্যা করে ফেলল। খবরটা এসে পৌছল সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের কানে।

এবার সুলতান রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। নরপিশাচ ড্রাকুলাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার মনস্থ করলেন। দেড়লাখ সৈন্যের বহর নিয়ে রুমানিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। খুব দ্রুত পৌছে গেলেন রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে। সেখানেই ড্রাকুলা বাহিনীর মোকাবেলা করলেন। তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন। উসমানি বাহিনীর হাতে নাকানিচুবানি খেয়ে একসময় ময়দান ছেড়ে পালালো ড্রাকুলার বাহিনী। কিন্তু ড্রাকুলাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হল না; কারণ, সে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল হাঙ্গেরি সম্রাটের দরবারে।

Scanned by CamScanner

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ বুখারেস্টের রাস্তা দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। পথিমধ্যে তিনি বুখারেস্ট শহরের এখানে-ওখানে মুসলিম বন্দিদের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখলেন। ড্রাকুলা এসব বন্দিদের বুলগেরিয়া থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছিল। এদেরকে হত্যা করে মরদেহকে এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখেছে। এদের মধ্যে যেমন আছে নারী-শিশু তেমনি আছে অশীতিপর বৃদ্ধ বৃদ্ধা! এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে সুলতান একেবারে ভেঙে পড়লেন!

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ বুখারেস্ট শহরে প্রবেশ করে শহরের গভর্নর নিযুক্ত করলেন ড্রাকুলার সহোদর 'রাউল'-কে। ড্রাকুলার সাথে এই রাউলই শিশুকাল থেকে উসমানি সালতানাতের অন্দরমহলে বেড়ে উঠেছেন। সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ তাকে লালনপালন করেছেন। কাছে থেকে দেখতে পেয়েছেন। তার উপর নির্ভর করতে পেরেছিলেন বলে আগেই তাকে 'ফালাখ'-এর গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।

ড্রাকুলা কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্র ছিল না। সে শক্তি সঞ্চয় করে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে উসমানি সালতানাতের মোকাবেলা করতে বের হল। কিন্তু এবারও সেই একই অবস্থা। আবারও পরাজয় বরণ করল উসমানি বাহিনীর হাতে। উসমানিদের হাতেই সে নিহত হল। হত্যার ব্যাপারটা নিশ্চিত করার জন্য তার মাথাকে ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের দরবারে প্রেরণ করা হল।

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ কর্তিত মস্তকটির দিকে একনজর তাকানোর পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এই সেই মানুষের মস্তক, যে একসময় উসমানি সালতানাতেরই হেরেমে লালিতপালিত হয়েছিল। কিন্তু তার পৈশাচিকতা আজ তার এই পরিণতি ডেকে নিয়ে এসেছে। এরপর সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ ড্রাকুলার কর্তিত মস্তক দেশের শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, অলিতে-গলিতে প্রদক্ষিণ করার নির্দেশ দিলেন। সবশেষে মস্তকটিকে একটি পেরেকের মধ্যে বিদ্ধ করে রাখার আদেশ জারি করলেন–যাতে মানুষ ড্রাকুলার হত্যার ব্যাপারটি জানতে পেরে খুশি হয় এবং সারাজীবনের জন্য এ ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে।[২৩]

---

২৩. আল ফাতিহুল কাইদ–৬৩-৮৬ বাসসাম আল আসলি। *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ ফিল উসুরিল উসতা-১৭০, মাহমুদ মুহাম্মাদ আল হুয়াইরি। *আল উসমানিয়্যুন ফিত তারিখ ওয়াল

Scanned by CamScanner

আজব সুড়ঙ্গপথ

দীর্ঘদিন থেকে উসমানি বাহিনী কনস্টান্টিনোপল শহরকে পদানত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই সুবিধে করতে পারছে না। দিনরাত উসমানি বাহিনীর কামানগুলো তোপ বর্ষণ করে যাচ্ছে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের ওপর। প্রাচীরগুলো এতোই মজবুত যে একটু ফাটল ধরেছে মাত্র। এ অবস্থায় কিছু উসমানি সেনার ধৈর্যের পেয়ালা ক্রমশ শুকিয়ে আসছে। তারা কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের স্বপ্নকে মনের মধ্যেই দাফন করতে শুরু করেছে। কিন্তু বেশিরভাগ সৈন্যই উদ্যম হারায়নি। তারা মোটেও আশাহত হয়নি। তারা সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের নিত্যনতুন কৌশল ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে কনস্টান্টিনোপলের খ্রিস্টান অধিবাসীরা প্রতি মুহূর্ত উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার সাথে অতিবাহিত করছে। তারা আশঙ্কা করছে, যে কোনো মুহূর্তেই উসমানিরা প্রাচীর ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে রক্তের সাগর বইয়ে দিতে পারে! একদিকে তারা খাদ্যাভাবে ক্ষুধায় কাতর, অপরদিকে আসমান বিদীর্ণকারী কামানের আওয়াজের ভয়ে পাথর! বিশেষ করে রাতের শেষ প্রহরে কামানের গোলাবর্ষণের কানফাটা শব্দ তাদেরকে মহাপ্রলয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

একরাতের কাহিনী। নির্ঘুম কনস্টান্টিনোপলবাসী হঠাৎ করেই মাটির নিচে মুহুর্মুহু মারাত্মক কিছু আওয়াজ শুনতে পায়! আওয়াজটা ক্রমাগত বাড়ছে এবং উপরের দিকে উঠছে। শুনে মনে হচ্ছে, আওয়াজটা নিচ থেকে উপরের দিকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে চলছে।

অবস্থার ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে কনস্টান্টিনোপলবাসী সম্রাট কনস্টান্টিন ও তার উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের কাছে খবর পাঠাল। খবর পেয়ে সম্রাটসহ সবাই দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হল। সম্রাট কনস্টান্টিন শহরের সকল ইঞ্জিনিয়ার ও মিস্ত্রিদের ডেকে পাঠালেন।

এসব ইঞ্জিনিয়ারদের একজন ছিল অস্ট্রিয়ান ইঞ্জিনিয়ার। নাম ছিল 'জেন গ্র্যান্ট'। সে তৎক্ষণাৎ অনুধাবন করতে পারল, মুসলমানরা বাইরে থেকে প্রাচীরের নিচ দিয়ে একটা গভীর সুড়ঙ্গ খনন করে শহরের অনেক ভেতরে চলে এসেছে। জেন গ্র্যান্টের কথা শুনে উপস্থিত সকলের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করে

হাজারাহা-৮৬, ড. মুহাম্মাদ হারব। *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ-৩৯, ড. আলি হাসুন। *আস সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ-৪৭, ড. সায়্যিদ রিজওয়ান আলি।

Scanned by CamScanner

ফেলল। সম্রাট কনস্টান্টিনও ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি সাথে সাথে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে উপরদিক থেকে এই সুড়ঙ্গের ঠিক মুখোমুখি আরেকটা সুড়ঙ্গ খনন করার আদেশ করলেন। সুড়ঙ্গ কিছুটা খনন হয়ে গেলে কর্মচারীদের খননকাজ বাদ দিয়ে উপরে এসে নীরব থাকার নির্দেশ দিলেন। তার কথামত সকলেই উপরে এসে উসমানিদের আত্মপ্রকাশের জন্য নীরবে অপেক্ষার প্রহর গুনতে লাগল।

মাটির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খননকারী উসমানিরা অপরদিকের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মোটেই অবহিত হতে পারল না। তারা জানতে পারল না যে, অচিরেই তারা পাতা ফাঁদে পতিত হতে যাচ্ছে। একসময় মুসলমানরা খুঁড়তে খুঁড়তে বাইজেন্টাইনদের খননকৃত সুড়ঙ্গ পর্যন্ত পৌছে গেল। এবার মুসলমানদের খুশি দেখে কে? তারা আনন্দের আতিশয্যে ভেতরে দুলতে লাগল। আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরেই তারা কনস্টান্টিনোপলের জমিনে পা রাখবে। শহরের প্রধান ফটক খুলে দিবে আর উসমানি সৈন্যরা হুড়মুড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করে শহরকে বিজয় করে নেবে!

কিন্তু না, তাদের এ আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না; তারা বাইজেন্টাইনদের তৈরি সুড়ঙ্গের মুখে আসতেই উপর থেকে ওঁতপেতে থাকা বাইজেন্টাইন সৈন্যরা তাদের উপর গোলা, গ্যাস ও দাহ্য পদার্থ ছুঁড়তে লাগল। মুহূর্তেই উসমানিদের অনেক সেনা সেখানে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। অনেকেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেল। কেউ বন্দি হল আবার কেউ সাথীদের লাশকে সুড়ঙ্গে ফেলে রেখে কোনোরকম প্রাণ নিয়ে ফিরে আসলো।

কিন্তু মুসলিমরা তো দমে যাবার পাত্র নয়; একবার তারা সাথীদের কয়েকজনকে হারিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেলেও বেশ কয়েকবার এভাবে সুড়ঙ্গপথ খুঁড়ে মাটির নিচ দিয়ে কনসটান্টিনোপলে পৌছার চেষ্টা করল।

কনস্টান্টিনোপলবাসী উসমানিদের এই সুড়ঙ্গ অভিযানকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল ঠিকই; কিন্তু এরপর থেকে তারা এতোটাই ভয়ার্ত হয়ে গিয়েছিল যে, সবসময় মৃত্যু তাদেরকে তাড়িয়ে ফিরত! প্রতিটা মুহূর্ত তারা শঙ্কায় থাকত–না জানি উসমানিরা মাটি ফুঁড়ে মৃত্যুদূতরূপে কখন বেরিয়ে এসে তাদেরকে মেরে ফেলে! বস্তুত বাইজেন্টাইনদের মনে 'সুড়ঙ্গপথ' একটা মানসিক যুদ্ধ হয়ে রইল। এমনকি তাদের অনেকেই যখন-তখন উসমানিদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেত! যত্র-তত্র জমিনের নিচে সুড়ঙ্গ খননের অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেত![২৪]

২৪. আল খিলাফাতুল উসমানিয়্যাহ-১৪২, আবদুল মুনইম আল হাশিমি। *আস সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ-১০৯, আবদুস সালাম আবদুল আজিজ ফাহমি।

Scanned by CamScanner

কনস্টান্টিনোপলের আধ্যাত্মিক বিজয়ী

উসমানি সেনাবাহিনী কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে ফেলেছে। শহর পদানত করার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ। আল্লাহ চাইলে মুসলমানরা অচিরেই কুফুরের মসনদ উল্টিয়ে দিবে। এগারশ বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে গুটিয়ে কালের খোয়াড়ে হারিয়ে যাবে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য। পতন ঘটবে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের। কিন্তু আশু বিজয়ের সমূহ সম্ভাবনাই নেই। কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরগুলো খুবই মজবুত। উসমানিদের গোলার আঘাতে প্রাচীরে একটুও চিড় ধরতে দেখা যাচ্ছে না। না জানি কতোদিন লাগবে প্রাচীর ভাঙতে।

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ চাইলেন কনস্টান্টিনোপল হামলায় যেন তার পাশে শরিক হোন তারই উস্তাদ ও মুরুব্বি 'শায়খ আক শামসুদ্দিন'। আল্লাহর ওলির অংশগ্রহণে কনস্টান্টিনোপলের হামলা হোক বরকতময়। তাই তিনি লোক পাঠালেন 'শায়খ আক শামসুদ্দিন'র খেদমতে। শায়খের তাবুর কাছে আসতেই বাধাগ্রস্ত হল সুলতানের পাঠানো লোক। তাবুর প্রহরীরা তাকে বাধা দিয়ে বসল। কারণ, শায়খ কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, তার অনুমতি ছাড়া যেন কেউ তাবুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে।

লোকটি বিষণ্ন মনে ফিরে এল সুলতানের কাছে। তার চেহারা দেখেই সুলতান কিছুটা অনুমান করতে পারলেন। বললেন,

-উস্তাদজিকে বলেছ?

-না জাঁহাপনা!

-কেন?

-শায়খের তাবুর ভেতরে ঢুকতেই পারিনি। তার প্রহরীরা বাধা দিয়েছে!

-কেন? বাধা দিবে কেন?

-শায়খ নাকি কাউকেই ভেতরে ঢুকতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

সুলতান রেগে গেলেন। তিনি নিজেই তাকে নিয়ে আসতে শায়খের তাবুর দিকে রওয়ানা হলেন। তাবুর নিকটবর্তী হতেই প্রহরীরা সুলতানকে বাধা দিয়ে বসল। তারা তাকে শায়খের কড়া নির্দেশ শুনিয়ে দিল। শুনে তো সুলতান রাগে অগ্নিশর্মা। তিনি জোর করে তাবুতে প্রবেশ করতে চাইলেও ব্যর্থ হলেন। এবার সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়লেন। আস্তিনের ভেতর থেকে খঞ্জর টেনে বের করে তাবুর পর্দা কেটে ফেললেন! কিছু জায়গা কেটে ফাঁক করে ভিতরে দৃষ্টি দিলেন।

Scanned by CamScanner

ভেতরে দৃষ্টি বুলাতেই তিনি যা দেখতে পেলেন, তাতে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। দেখলেন, 'শায়খ আক শামসুদ্দিন' সেজদায় পড়ে কান্নাকাটি করছেন। বেসামাল হয়ে কান্নাকাটি করার কারণে তার মাথা থেকে পাগড়ি ফসকে মাটিতে পড়ে আছে। তার মাথার সফেদ চুলগুলোও এলোমেলো হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। সফেদ চুলগুলো সফেদ দাড়ির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে!

এরপর সুলতান দেখলেন 'শায়খ আক শামসুদ্দিন' সেজদা থেকে মাথা উত্তোলন করেছেন। তার গণ্ড বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। এতক্ষণ তিনি মাওলার কাছে কেঁদেকেটে সাহায্য চেয়েছিলেন। কনস্টান্টিনোপলের আশু বিজয়ের জন্য আল্লাহর দরবারে সাহায্য কামনা করেছিলেন।

এরপর সুলতান তার নির্ধারিত যুদ্ধের ঘাঁটিতে ফিরে গেলেন। গিয়ে দেখতে পেলেন, উসমানি সেনাবাহিনী কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর কিছুটা ভেঙে হুড়মুড় করে শহরের ভেতরে প্রবেশ করে চলছে। তার মানে কনস্টান্টিনোপল শহর উসমানিদের কাছে পদানত!

সৈন্যদের ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে সুলতান যারপরনাই খুশি হলেন। তার বুঝতে আর বাকি রইল না যে, এ বিজয় তার উস্তাদজি 'আক শামসুদ্দিন'র চোখের পানির ফসল। সুলতান তখন বলে উঠলেন, আমার খুশি কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্য নয়; আমি এজন্য খুশি যে, 'শায়খ আক শামসুদ্দিন'র মতো আল্লাহর ওলি আমার শাসনামলে আছেন।

এজন্যই সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের উস্তাদ 'শায়খ আক শামসুদ্দিন'-কে কনস্টান্টিনোপলের অধ্যাত্মিক বিজয়ী বলা হয়। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন 'শায়খ আক শামসুদ্দিন'। তিনি ছোটবেলা থেকেই সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহকে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে আসছেন। তিনি সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহকে ছেলেবেলাতে প্রায়ই একথা বলতেন,

'হে মুহাম্মাদ! কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যতবাণীকৃত সৌভাগ্যবান সেই বিজয়ী ব্যক্তি কিন্তু তুমিই।'[২৫]

---

২৫. হাদিকাতুস সালাতিন-৭৫, উসমান নিজার। *আল খিলাফাতুল উসমানিয়্যাহ-১৪৩, আবদুল মুনইম হাশিমি।

উত্তম সেনাপতি ও তার সেনাদল

দীর্ঘ অবরোধের পর অবশেষে উসমানিদের স্বপ্ন হাতের মুঠোয় ধরা দিতে শুরু করেছে। বিজয় অতি সন্নিকটে। কেননা উসমানি সৈন্যরা ক্রমাগত গোলা বর্ষণ করে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের অনেক জায়গায় বেশ বড় বড় ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছে। পতনের ঘনঘটা দেখতে পেয়ে কনস্টান্টিনোপলবাসীও ভয়ে একেবারে হতবিহ্বল হয়ে পড়ল। সম্রাট কন্সটান্টিন সাধারণ ফরিয়াদের ঘোষণা জারি করলেন। সম্রাটের ঘোষণা শোনার সাথে সাথে খ্রিস্টান ক্যাথলিক ও অথেনটিক ধর্মগুরু এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা শোভাযাত্রার মাধ্যমে কুমারি মেয়েদের ছবি ও ধর্মীয় পূজনীয় বিভিন্ন চিত্রাবলী হাতে নিয়ে কনস্টান্টিনোপলের অলি-গলিতে চক্কর দিতে লাগল এবং মাথা ও বুক চাপড়িয়ে, কাপড় ছিড়ে, চুল ছিড়ে বিলাপ করে কাঁদতে থাকল! ধর্মীয় বিরহী, মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক গীতি গাইতে শুরু করল। আসমানের দিকে হাত উত্তোলন করে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে থাকল, যাতে আল্লাহ তাআলা তাদের গোনাহকে মাফ করে দেন এবং আশু বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন। পাদ্রি ও খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা জনসাধারণকে ওয়াজ-নসিহত করে যেতে থাকল। তারা এই বলে প্রবোধ দিতে লাগল যে, অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তুর্কিদেরকে কনস্টান্টিনোপলের ফটক থেকে তাড়িয়ে দেবেন।

দেখতে দেখতে একসময় উসমানি জানবাজরা কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ভেঙেই ফেলল। মুহূর্তের মধ্যেই বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো উসমানি সৈন্যরা হুড়মুড় করে প্রবেশ করতে লাগল কনস্টান্টিনোপলের ভিতরে। কনস্টান্টিনোপলের বিভিন্ন স্থাপনায় পতপত করে উড়তে লাগল ইসলামি পতাকা।

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ তার তাজি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে সৈন্যদের তাকবির ধ্বনি দিয়ে শহরে প্রবেশ ও তাদের বিজয়োল্লাসকে মন ভরে উপভোগ করছিলেন। সুলতানের ঘোড়ার লাগাম ধরেছিলেন তার দেহরক্ষী 'কালালি ইউসুফ'। বিজয়ানন্দ উপভোগ করতে সুলতানের দিকে এগিয়ে আসলেন উসমানি সালতানাতের মন্ত্রী, কমান্ডার, উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা ও সালতানাতের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। সকলেই এসে ঘিরে দাঁড়ালেন সুলতানের ঘোড়াকে। সকলের মুখেই খুশির আভা। বিজয়ানন্দের ঝলক।

Scanned by CamScanner

সকলেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে সুলতানকে উষ্ণ অভিবাদন ও অভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। তারা বলতে লাগলেন, 'মারহাবা হে সুলতান মারহাবা! আল্লাহ আপনার জিহাদে বারাকাহ দান করুন! প্রতিউত্তরে সুলতান শুধু বললেন,

'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদের শহিদদের রহম করুন এবং আমাদের মুজাহিদিনদের মান-মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিন এবং আমাদের জাতির গৌরবকে আরও উন্নীত করুন।'

এরপর সুলতান এক রাজকীয় শোভাযাত্রার মাধ্যমে মন্থরগতিতে কনস্টান্টিনোপলের চওড়া রাস্তা দিয়ে সামনে এগুতে লাগলেন। যখন শহরের একেবারে মাঝামাঝি পৌঁছে গেলেন, হঠাৎ তিনি ঘোড়া থামিয়ে দিলেন। তাকে বেষ্টন করে আগানো সৈন্য ও ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

> "হে গাজি মুজাহিদরা! আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। আপনারা তো কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী হয়ে গেলেন। কতোই-না সৌভাগ্য আপনাদের! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গিয়েছেন- "অবশ্যই কনস্টান্টিনোপল বিজয় করা হবে। কতোই-না উত্তম সেই সেনাপতি ও কতোই-না উত্তম সেই সেনাদল!"

কনস্টান্টিনোপল বিজয় হয়ে গেল। সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ হলেন বিজেতা। তখন থেকেই তিনি উপাধি পেলেন সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ। এভাবেই ইতিহাসের পাতা থেকে খসে পড়ল প্রায় সাড়ে এগারশ বছরের ঐতিহ্যবাহী পূর্ব রোমান 'বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য'। কবরস্থ হয়ে গেল প্রাচ্য থেকে ক্রুসেডের আঁতুড়ঘর। বিস্তৃত হল উসমানি সালতানাতের সীমানা। কনস্টান্টিনোপলের নাম পালটিয়ে রাখা হল ইসলাম্বুল বা ইসলামের শহর। অতঃপর ইস্তাম্বুল। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী 'কনস্টান্টিনোপল' হয়ে গেল উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী 'ইস্তাম্বুল'।[২৬]

---

২৬. আল খিলাফাতুল উসমানিয়্যাহ–১৫৪-১৬২, আবদুল মুনইম আল হাশিমি।

Scanned by CamScanner

তরবারির অবদান ভুলে গেলে চলবে না

মুসলমানদের স্বপ্ন পূর্ণ হল। সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করে কনস্টান্টিনোপল বিজয় করলেন। কনস্টান্টিনোপল থেকে ইসলাম্বুল: অতঃপর ইস্তাম্বুল নামকরণ করা হল। মানে ইসলামের শহর। কনস্টান্টিনোপল বিজয় করার কারণেই সুলতান মুহাম্মাদকে 'ফাতিহ' বা বিজয়ী উপাধী দেয়া হয়।

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ শহরে প্রবেশ করছেন তার সাদা তাজি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে। তাকে ঘিরে আছেন মন্ত্রী, উলামা, কমান্ডার, সৈন্যবাহিনী ও সালতানাতের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

কনস্টান্টিনোপলের কয়েক হাজার খ্রিস্টান ভয়ে 'আয়াসুফিয়া' গির্জায় আশ্রয় নিয়েছে। তারা শেষমেষ মুক্তির জন্যে অধীর অপেক্ষা করে চলছে। কারণ, তাদের কিছু যাজক তাদেরকে এই আশ্বাস দিয়েছে যে, আসমান থেকে একজন ফেরেশতা নেমে এসে মুসলমানদেরকে জ্বালিয়ে দেবেন। আর মুসলমানেরা আয়াসুফিয়া গির্জা পর্যন্ত কখনও পৌঁছতে পারবে না। কারণ, ওই ফেরেশতা মুসলমানদেরকে 'জাম্বিরলি তাশ' নামক রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছতেও সুযোগ দেবেন না। এ রাস্তা আয়াসুফিয়া গির্জা থেকে ৩০০ মিটার দূরে।

আর বাকি খ্রিস্টান অধিবাসীরা তোপকাপি ও আয়াসুফিয়া গির্জার মিলনমোহনায় দাঁড়িয়ে সুলতানের শহরে প্রবেশের শোভাযাত্রাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ করে উসমানি সেনাবাহিনীর ভিড় থেকে একজন দরবেশ বের হলেন। বের হয়েই তিনি সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের ঘোড়ার ঝুঁটি ধরে সুলতানকে থামিয়ে দিলেন। থামিয়ে দিলেন পুরো শোভাযাত্রাকে। সুলতানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মহামান্য সুলতান! আপনি ভুলে যাবেন না... আপনি ভুলে গেলে চলবে না যে, এই যুদ্ধে আপনি আমাদের দরবেশদের দোয়ার বদৌলতে বিজয়ী হয়েছেন।

দরবেশের কথা শুনে সুলতান মুচকি হাসলেন। এরপর তিনি তার কোমরে রক্ষিত তলোয়ারের খাপের দিকে হাত বাড়ালেন। টেনে টেনে তলোয়ারটি অর্ধেক পর্যন্ত খাপমুক্ত করে দরবেশকে লক্ষ করে বললেন–

'আপনি ঠিক বলেছেন হে দরবেশ! তবে আপনি এই তলোয়ারের অবদানকে ভুলে গেলে চলবে না।'[২৭]

---

২৭. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-৪৩, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

Scanned by CamScanner

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের বদান্যতা

কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটলে খ্রিস্টানরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দলে দলে আয়াসুফিয়া গির্জায় গিয়ে আশ্রয় নিল। সেখানে তারা সমবেত হয়ে কান্নাকাটি আর ফরিয়াদ জুড়ে দিল! সেজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে লাগল। পাদ্রি ও ধর্মগুরুদের হুকুমে আল্লাহর কাছে নিজেদের মুক্তির দোয়া করতে লাগল।

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পরপরই উসমানি সৈন্যদেরকে রক্তপাত আর হত্যাযজ্ঞ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে রাখলেন। গোটা শহরবাসীকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে যার যার ঘরে গিয়ে বাস করার আদেশ জারি করলেন। সবাইকে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করলেন।

তিনি তার শাহি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে কনস্টান্টিনোপলের রাজপথ দিয়ে সামনে এগুচ্ছিলেন। হঠাৎ করেই ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে অবতরণ করে জমিনে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে মাথায় ঘর্ষণ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শুকরিয়া আদায় করলেন। এরপর আবার ঘোড়ায় আরোহণ করে আয়াসুফিয়া গির্জার দিকে রওয়ানা হলেন। যখন সুলতান আয়াসুফিয়া গির্জার নিকটে চলে আসলেন, তার কর্ণকুহরে এসে পৌছল হৃদয়বিদারক কিছু চাপাকান্নার আওয়াজ! তিনি বুঝতে পারলেন, এসব আয়াসুফিয়ার অভ্যন্তরে সম্মিলিতভাবে প্রার্থনার আওয়াজ।

সুলতান ঘোড়া থেকে অবতরণ করে আয়াসুফিয়া গির্জার একটি দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। দরজাটি ছিল খুবই মজবুত ও ভেতর থেকে লাগানো। গির্জার পাদ্রি সুলতানের আগমন টের পেয়ে ভেতর থেকে দরজা খুলে দেয়ার আদেশ দিল। সুলতান অত্যন্ত শান্তশিষ্টভাবে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

আয়াসুফিয়ার অভ্যন্তরে অবস্থিত খ্রিস্টানরা ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেল! সুলতানকে দেখে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তারা মনে করল, এই বুঝি তাদেরকে মেরে ফেলা হবে! আয়াসুফিয়ার পবিত্র মেঝে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে! অথবা সব দরজা লাগিয়ে তাদেরকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া হবে! তাই তারা তাদের প্রার্থনা ও অন্যান্য কর্ম ছেড়ে দিয়ে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রইল। ড্যাব ড্যাব করে তকিয়ে রইল সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের দিকে।

Scanned by CamScanner

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ আয়াসুফিয়ার পাদ্রিকে আগের মতো প্রার্থনা ও অন্যান্য কর্ম জারি রাখার আবেদন করলেন। প্রত্যেক মানুষ যেন স্ব স্ব জায়গায় প্রশান্তির সাথে ইবাদত করে যায়, কোনো প্রকার ভয়ভীতি বা পেরেশানি ছাড়া। সুলতানের কথামত খ্রিস্টানরা তাদের ইবাদত পূর্ণ করে নিল। সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন আয়াসুফিয়ার মেঝে। সিজদায় পড়ে আল্লাহর হামদ ও শুকর আদায় করতে লাগলেন।

সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ পাদ্রিরকে তলব করে বললেন, তিনি যেন সবাইকে এই ঘোষণা শুনিয়ে দেন–তারা সকলেই সম্পূর্ণ স্বস্তি ও নিরাপত্তার সাথে যার যার ঠিকানায় চলে যায়। তাদের কোনো ভয়ভীতি নেই। সকলেই যেন তাদের আগের পেশা ও চাকরিতে লেগে যায়।

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের এই ঘোষণাটা প্রখর রৌদ্রতাপের পর একপশলা শীতল বৃষ্টির মতো কাজ করল ভয়ার্ত খ্রিস্টানদের উপর। তারা নিজেদের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না! তারা মনে মনে ভাবল, এ-ও কি সম্ভব? তারা তো শুনেছিল, মুসলিমরা খুবই পিশাচ! সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ একজন রক্তখেকো! কিন্তু এখন তারা এ কী দেখতে পাচ্ছে! মানুষটা যা বলছে তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে কী-ইবা দরকার ছিল এতো ভয়ের? এতো কান্নাকাটির? এতো ফরিয়াদের? সুলতানের কথা শুনে তাদের মাঝে বিরাজ করতে লাগল স্বস্তি ও প্রশান্তি। তারা শান্তমনেই ফিরে গেল নিজ নিজ ঠিকানায়। সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ পুরো শহরে ঘোষক পাঠিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী পৌঁছিয়ে দিলেন।

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ পুরো 'আয়াসুফিয়া' ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন, ইত্যবসরে পেছন থেকে তিনি কোনো কিছু ভেঙে ফেলার মত আওয়াজ শুনতে পেলেন। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলেন, একজন উসমানি সৈন্য তার হাতের হাতুড়ি দিয়ে আয়াসুফিয়ার মর্মর পাথরের একটা খুঁটি ভেঙে ফেলছে। এই খুঁটির মধ্যে খ্রিস্টানদের পূজনীয় কোনো পবিত্র চিত্র টানানো ছিল। সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ ওই সৈন্যের কাছে গিয়ে তাকে লক্ষ করে রাগত স্বরে বললেন,

-এটা কী করছ তুমি?'

-আপনি কি মুসলিম নন? আমি কাফেরদের নিদর্শনাবলী মিটিয়ে ফেলতে চাই!

Scanned by CamScanner

-কিন্তু কোনো প্রার্থনার স্থান ভেঙে ফেলা তো মোটেই উচিত নয়!

এই বলে সুলতান ওই আনাড়ি সৈন্যের হাত থেকে হাতুড়ি কেড়ে নিয়ে তা দিয়েই তার মাথায় একটা আঘাত করলেন। আঘাতের চোটে সৈন্যটি পেছনে উল্টে পড়ল।

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের আয়াসুফিয়ায় আগমন টের পেয়ে বেশ কয়েকজন পাদ্রি ও খ্রিস্টান ধর্মগুরু ভয়ে তড়িৎ আয়াসুফিয়ার পাতালকুঠরিতে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল। কিন্তু যখন তারা সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের ঘোষণা ও কর্ম সম্পর্কে অবগত হল, সাথে সাথে গোপন পাতালকুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে প্রকাশ্যে কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। এদের একজন ছিলেন 'বাবা মুহাম্মাদ'।

উসমানিদের হাতে কনসটান্টিনোপলের পতন ঘটতেই বাইজেন্টাইন সম্রাট কনস্টান্টিন পলায়ন করেছিল। কিন্তু পলায়নের মধ্যেই মারা গিয়েছিল। সুলতান যখন সম্রাটের মৃত্যুর খবর পেলেন, কনস্টান্টিনের লাশ আনিয়ে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক রাজকীয় আড়ম্বরতার সাথে সমাহিত করলেন। সুলতান খবর নিলেন বাইজেন্টাইন সেনাপতি 'জেস্টানিন'-এর। তিনি জানতে পারলেন, সে কনস্টান্টিনোপলের স্বর্ণকোণের সমুদ্রবন্দরে আহত হয়ে ওখানেই তার নোঙরকৃত জাহাজে চিকিৎসা নিচ্ছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে তাকে সেখান থেকে নিয়ে এসে বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করালেন।[২৮]

---

২৮. আল খেলাফাতুল উসমানিয়্যাহ-১৬৩, আবদুল মুনইম আল হাশিমি।

সুলতান আলফাতিহ ও সিনান পাশা

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ শহরের কেল্লা আর প্রাচীর ঘিরে কিছু জরুরি আইন ও দিকনির্দেশিকা প্রণয়ন করলেন। এর একটি ছিল, "মাগরিবের আজান হওয়ার সাথে সাথে শহরের সবগুলো কেল্লার ফটক লাগিয়ে দিতে হবে। ফজর পর্যন্ত ফটকগুলো বন্ধ থাকবে। মাগরিব থেকে ফজর পর্যন্ত ফটক খোলার কোনোই অনুমতি থাকবে না।"

এ আইন ও নির্দেশিকা প্রয়োগ করার জন্য একটা গ্রুপ ঠিক করে দেয়া হয়। নির্দেশিকার ফলে নিষিদ্ধ হয়ে যায় সূর্যাস্ত থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত শহরে প্রবেশ। নির্দেশিকাটি জারি করা হয়েছিল শহরের নিরাপত্তার স্বার্থে।

উক্ত নির্দেশিকা প্রয়োগকারীদের একজন ছিলেন 'সিনান চলপি পাশা'। তার দায়িত্ব ছিল 'উনকুবানি' নামক এলাকার কেল্লায়।

একদিন সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে তার নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে ইস্তাম্বুল শহরের প্রাচীরের বাইরে গিয়েছিলেন। শহরে ফিরতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। মাগরিবের আজান হয়ে যাওয়ায় ফটকের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

তখন সুলতানের জনৈক দেহরক্ষী সিনান পাশাকে দরজা খুলে দেয়ার জন্য ডাক দিলে সিনান পাশা তার জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। উপর থেকে উঁকি দিয়ে নিচের দিকে দেখতে চেষ্টা করে। কিন্তু অন্ধকারে কাউকে চিনতে না পারায় কেল্লা থেকে ফটকের কাছে চলে আসে। প্রাচীরের কাছে এসেই প্রশ্ন ছুড়ে–আপনারা কারা?

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ উত্তর দেন, 'সিনান চলপি! ফটক খুলে দাও'!

সিনান পাশা সুলতানের কণ্ঠ চিনতে পারল না। এদিকে সুলতানও নিজের পরিচয় প্রকাশ করছেন না। সিনান আবার জিজ্ঞেস করল আপনারা কারা? আর কেনোইবা এতো দেরি করলেন?

- আমরা কারা এটা তোমার জানতে হবে না। তাড়াতাড়ি ফটক খুলে দাও!

সিনান পাশা রেগে গেল! বলল, 'অবশ্যই আমি দরজা খুলে দেব না। আপনারা কি মহামান্য সুলতানের নির্দেশ শুনেননি? হয়ত আপনারা এখান থেকে চলে যান নতুবা নতুবা ফজর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকুন। আপনারা কি চান, আমি মহামান্য সুলতানের নির্দেশ অমান্য করি? অযথা তার ধমক শুনি'?

সুলতান হেসে বললেন, 'সিনান! আমি দায়িত্ব নিলাম তুমি সুলতানের ধমক খাবে না'!

Scanned by CamScanner

-আপনি কে, যে আমার জন্য জামিনদার হতে চাচ্ছেন? আপনি কি তবে নিজেকেই সুলতান মনে করেন?

-সিনান! তুমি চিনতে ভুল করছো, আমিই সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ। তুমি কি আমার কণ্ঠস্বর থেকে আমাকে চিনতে পারোনি?

কথাটা শোনার সাথে সাথেই যেন তড়িতাহত হয়ে পড়ল সিনান। তোতলাতে তোতলাতে বলতে লাগল, ক্ষমা করুন জাঁহাপনা! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি! তাছাড়া কল্পনাও করতে পারিনি–আপনি নিজেই নিজের জারিকৃত আইন ও নির্দেশের খেলাফ করবেন!

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ প্রাচীরের ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। ঘোড়া থেকে নিচে নেমে সিনান পাশার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তুমি আমার একজন উত্তম সেনা! আমার জারিকৃত আইন ও নির্দেশিকার উপর তোমার অবিচলতা দেখে আমি মুগ্ধ। তুমি যা চাইবে আমি তা দেব। বল কী চাও'!

সুলতানের কথা শুনে সিনান ভড়কে গেল! কারণ, সুলতান তার সামনে চাওয়া-পাওয়ার সবকটি দরজা খুলে দিয়েছেন! এখন ইচ্ছে করলে যে কোনো পদ চাইতে পারবে। চাইলে মোটা অঙ্কের অর্থেরও মালিক হতে পারবে। এদিকে সুলতানও মুচকি হেসে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। অপেক্ষায় আছেন সিনান পাশা কী চায় শুনবেন। দেরি করল না সিনান। সে মনে মনে ঠিক করে নিল, সুলতানের কাছে অর্থকড়ি চাইবে না। চাইবে না কোন পদ-মর্যাদাও। আজ সে সুলতানের কাছে সেই আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করবে, যেটি সে অনেক দিন থেকে মনের মণিকোঠায় লালন করে আসছে। ধীর কণ্ঠে বলল,

'জাঁহাপনা! আমি কিছু চাই না, কেবল এটুকুই চাই–আপনি আমার নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দিবেন'।

সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ সিনান পাশার আকাঙ্ক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করে অধীনস্থদের সিনান পাশার নামে একটি মসজিদ নির্মাণের আদশ দিয়ে দেন।

আপনি কখনও ইস্তাম্বুল ভ্রমণে গেলে সেখানকার লোকজনকে 'সিনান পাশা জামে মসজিদ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে নিবেন। সেই ঐতিহাসিক নয়নাভিরাম মসজিদটি দেখে নিবেন। আর দু-রাকআত নামাজ পড়ে তার জন্য দোয়া করতে ভুলবেন না।[২৯]

---

২৯. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-৪৫, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

Scanned by CamScanner

শায়খের প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধা

ইমাম শওকানি রাহ. বলেন, কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পরদিন সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ তার উস্তাদ শায়খ আক শামসুদ্দিনের তাবুতে যান। শায়খ তখন শোয়া অবস্থায় ছিলেন। সুলতানকে দেখে তিনি তার সম্মানার্থে দাঁড়াননি। সুলতান এগিয়ে এসে শায়েখের হাতে চুমু খেয়ে উস্তাদকে লক্ষ করে বলেন,

-আফেন্দি!

-বলো!

-একটি প্রয়োজনে এসেছি।

-কী প্রয়োজন?

-আপনি একাকি যেখানে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হন আমি সে নির্জন ইবাদতখানায় ঢুকতে চাই।

-না!

-আফেন্দি! অনুগ্রহ করুন, অনুমতি দিন।

-কখনও হবে না!

চটে গেলেন সুলতান। রাগতস্বরেই বললেন,

> 'একজন সাধারণ তুর্কি আপনার কাছে এসে মাত্র একটি কথা বললেই আপনি তাকে আপনার নির্জন ইবাদতগাহে ঢুকে ধ্যানে মগ্ন হওয়ার অনুমতি দিয়ে দেন, অথচ আমি বারবার বলা সত্ত্বেও আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন না?'

শায়খ আক শামসুদ্দিন জবাবে বললেন,

> 'তুমি আমার ইবাদতখানায় ঢুকে গেলে যে অমৃত স্বাদ অনুভব করবে সে স্বাদের কাছে রাজত্বের স্বাদ বিস্বাদ হয়ে যাবে। চোখ থেকে রাজত্বের স্বপ্ন হারিয়ে যাবে। এর অনিবার্য পরিণতি দাঁড়াবে-উসমানি সালতানাতের ধ্বংস ও পতন। আল্লাহ তাআলা এটা পছন্দ করবেন না। ইবাদতখানায় প্রবেশ করার উদ্দেশ্য তো হল, ন্যায়নীতি ও ভারসাম্যতা অর্জন করা। তুমি বরং এই এই কাজগুলো করবে।'

এভাবে 'শায়খ আক শামসুদ্দিন' তার শাগরিদ সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নসিহত করে দেন। নসিহত শোনার পর সুলতান তাকে

Scanned by CamScanner

একহাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) হাদিয়া প্রদান করলেন। কিন্তু শায়খ তা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিলে সুলতান নিজের মাল নিজেই সামলে নেন।

সুলতান তার 'শায়খ আক শামসুদ্দিন'র তাবু থেকে বেরিয়ে আসার পর সাথের অনুচরদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

'শায়খ আমাকে দেখে দাঁড়াননি।'

অনুচররা বলল,

'সম্ভবত তিনি আপনার মাঝে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের দ্বারা কোনো প্রকার অহঙ্কার প্রত্যক্ষ করেছেন; যা আপনার মতো মহান সুলতানের পক্ষে মোটেও মানায় না, তাই তিনি তার কর্মের মাধ্যমে আপনার থেকে সেই অহঙ্কার বা বড়ত্বকে দূরীভূত করতে চেয়েছেন।'[৩০]

৩০. হাদিকাতুস সালাতিন-৭৮, উসমান নিজার।

Scanned by CamScanner

যে সুলতান কাপড়ের ধুলোবালি শিশিতে ভরে রাখতেন

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ (১৪৮১-১৫১২)। সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের সুযোগ্য সন্তান। যখনই কোনো জিহাদের ময়দান থেকে ফিরতেন, ফেরার পথে জিহাদরত অবস্থায় কাপড়ে লেগে যাওয়া সব ধুলোবালি একটি শিশিতে ভরে রাখতেন। এটাই ছিল তার অভ্যাস।

এই অভ্যাস নীরবে প্রত্যক্ষ করতেন তার স্ত্রী গুলবাহার। তবে কিছুই বলতেন না; শুধু দেখে যেতেন। কিন্তু কতদিন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখে যাওয়া যায়। একদিন বলেই ফেললেন,

-একটি প্রশ্ন করতে পারি জাঁহাপনা?

-করতে পারো গুলবাহার!

-এই ধুলোবালি শিশিতে ভরে রাখার কী ফায়দা? কী উদ্দেশ্য?

-গুলবাহার! আমি শিশির ভেতরকার এসব ধুলোবালি দিয়ে একটি মাটির মাদুলি বানাব। মৃত্যুর পর এই মাদুলিটি আমার কবরে মাথার নিচে রাখার অসিয়ত করে যাব। গুলবাহার! তুমি কি জানো না, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন?

বাস্তবেই সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদের অসিয়ত প্রযোজ্য করা হয়েছিল। শিশির ভেতরকার ধুলোবালি দিয়ে মাটির একটি মাদুলি বানিয়ে তার কবরে মাথার নিচে রাখা হয়েছিল।

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তার কবর নিজেরই নির্মিত 'বায়েজিদ জামে মসজিদ'র পাশে অবস্থিত।[৩১]

---

৩১. রাওয়াইয়্যু মিনাত তারিখিল উসমানি-৫৬, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

Scanned by CamScanner

যে সুলতানের এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়নি

ইস্তাম্বুলের মসজিদগুলোর মধ্যে 'বায়েজিদ জামে মসজিদ' একটি বড়, জাঁকজমকপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী মসজিদ। মসজিদটি কালের সাক্ষী হয়ে ইস্তাম্বুল ভার্সিটির পাশে আজও স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে।

মসজিদটির নির্মাতা ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ। তিনি ছিলেন একজন মুত্তাকি, পরহেজগার সুলতান। বায়েজিদ জামে মসজিদের নির্মাণকাজ শেষ হবার পর মসজিদ উদ্বোধনের দিন মুসল্লিরা অপেক্ষা করছিল, কে ইমামতি করবে: মসজিদের নির্ধারিত ইমাম, নাকি খেলাফতের প্রধান মুফতি শায়খুল ইসলাম, নাকি অন্য কোনো আলেম?

মসজিদের ইমাম সাহেব ঘোষণা করলেন, উদ্বোধনী ইমামতি তিনিই করবেন, যার জীবনে কোনো ফরজ নামাজ কাজা হয়নি। শর্ত শুনে মানুষতো হয়রান! তারা ভাবছিল এমন মানুষ কি সম্ভব?

একে অপরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। পলপল করে সময় এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসছে না দেখে সকলকে অবাক করে ধীরপায়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন স্বয়ং সুলতান! মেহরাবে গিয়ে নীরবেই শুরু করলেন নামাজ। মানুষও ধন্য হলো এমন মহান সুলতানের ইমামতিতে নামাজ আদায় করতে পেরে।

হ্যাঁ, এই ছিল সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদের আমলনামা। যার জীবনে এক ওয়াক্তও ফরজ নামাজ কাজা হয়নি। তিনি ছিলেন একজন বুজুর্গ শাসক। খোদাভীরু আল্লাহর ওলি।[৩২]

---

৩২. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-৩১, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

সুলতানকে অপসারণের ফাতওয়ার হুমকি

সুলতান প্রথম সালিম (১৫১২-১৫২০) ছিলেন কঠিন ও রূঢ় প্রকৃতির। ছিলেন উসমানি খেলাফতের এক অগ্নিমানব। উপাধি ছিল 'ইয়াভুজ'। ইয়াভুজ তুর্কি শব্দ। অর্থ কঠিন বা রূঢ়। তিনি তার প্রণীত আইন অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতেন। তার নাম শুনলে গোটা ইউরোপ থরথর করে কেঁপে উঠত। ইরানের শিয়া শাসক ইসমাইল সাফাবিরও পিলে চমকে যেত তার নাম শোনামাত্র। কারণ, কালদিরান যুদ্ধে তিনি ইসমাইলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে জন্মের মতো স্বাদ মিটিয়ে দিয়েছিলেন উসমানি খেলাফতের বিরোধিতার। সুলতানের মৃত্যুতে তাই ইউরোপ ও শিয়াগোষ্ঠী ছিল যারপরনাই আনন্দিত।

একবার সুলতান জানতে পান, ইস্তাম্বুলের আর্মেনীয়, রোমান ও ইয়াহুদি সংখ্যালঘুরা খেলাফতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো শুরু করেছে। তারা বিভিন্ন কেল্লার অধিবাসীদের খেলাফতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে! খবরটা শোনামাত্র তিনি ক্রোধে অগিশর্মা হয়ে আইন জারি করলেন—হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে না হয় তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে!

সুলতানের কঠিন এ ফরমানের খবর গিয়ে পৌঁছে খেলাফতের প্রধান মুফতি শায়খুল ইসলাম 'জাম্বিলি আলি জামালি আফেন্দি'র কানে। বিষয়টি তাকে খুবই ভাবিয়ে তুললো। কারণ, সুলতানের ফরমানটা ইসলামের শাশ্বত বিধানের বিরোধী। ইসলামি শরিয়ত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমান বানানো সমর্থন করে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, 'দ্বীনের মধ্যে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই'।[৩৩] শরিয়তের এই চিরন্তন বিধানের বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ নেই। এতে সুলতান বা অন্য যে কেউই হোন না কেন।

কিন্তু কার এতোটা সাহস, যে সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে কথাটা বলবে? কে বলবে, সুলতান! আপনার সিদ্ধান্তটি ইসলামের চিরন্তন বিধানের বিপরীত?

শায়খুল ইসলাম সিদ্ধান্ত নিলেন, কথাটা তাকেই বলতে হবে। জুব্বা পরে সুলতানের মহলের দিকে রওয়ানা হলেন। সুলতান তার খাস কামরাতেই ছিলেন। ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি তলব করলেন। অনুমতি দেয়া হলে শায়খ কোনো ভূমিকা ছাড়াই সুলতানকে উদ্দেশ্য করে সরাসরি প্রশ্ন করলেন,

---

৩৩. সূরা বাকারা, আয়াত-২৫৬।

Scanned by CamScanner

'মহামান্য সুলতান! জানতে পারলাম, আপনি নাকি সংখ্যালঘুদের জোরপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

সুলতান তো রেগে আগুন! জবাবে বললেন,
'হ্যাঁ, আপনি সত্যই শুনেছেন, এতে আপনার কোনো অসুবিধা আছে?'

শায়খুল ইসলাম ছিলেন সত্যপ্রকাশে আপোষহীন। বললেন,
'মুহতারাম! আপনার সিদ্ধান্তটি ইসলামি শরিয়তের পরিপন্থী। শরিয়তের বিধান হচ্ছে কাউকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামে দীক্ষিত করা যাবে না। তাছাড়া সিদ্ধান্তটা আপনার দাদা সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহের নীতিবিরুদ্ধ। তিনি কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর পরিপূর্ণ শরিয়তের নীতির অনুসরণ করেছেন। অমুসলিমদের জোরপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করেননি। তাদেরকে ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছিলেন। আপনাকে শরিয়তের চিরন্তন বিধানের অনুসরণ করতে হবে। অনুসরণ করতে হবে আপনার সম্মানিত দাদা সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহকেও।'

শায়খুল ইসলামের বক্তব্য শুনে সুলতান প্রথম সালিম রাগে ফেটে পড়েন। সক্রোধে বলেন,
'জনাব আলি আফেন্দি! আপনি তো খেলাফতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে শুরু করেছেন! আপনি কি এর শেষ পরিণতি জানেন?'

শায়খুল ইসলাম জবাব দিলেন,
'জাঁহাপনা! আমি ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ প্রদানের স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতির ভিত্তিতেই কথাটা বলেছি। দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্যে নয়। আর আমার হায়াত শেষ না হলে কেউ আমার প্রাণ ছিনিয়ে নেতে পারবে না!'

সুলতান প্রথম সালিম বললেন,
'শায়খ! বিষয়টা আমার উপর ছেড়ে দিন। আপনি পিছু নিতে যাবেন না!'

শায়খুল ইসলাম বললেন,
'কখনও হতে পারে না জাঁহাপনা! আপনার আখিরাত বাঁচানো আমার উপর অপরিহার্য। আপনাকে এমনসব বিষয় থেকেও বাঁচানো আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত; যা আপনার আখিরাতের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। এতে যদি ভিন্ন কোনো পন্থা অনুসরণ করতে হয় তবুও!

Scanned by CamScanner

সুলতান আরও রেগে গিয়ে বললেন,
'আপনি কী চান?'

শায়খুল ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দিলেন,
'আপনি সিদ্ধান্তে অটল থাকলে অচিরেই আমি আপনাকে শরিয়তের বিধানের বিরোধিতা করার কারণে খেলাফতের পদ থেকে অপসারণের ফতোয়া জারি করব!'

এবার সুলতান শায়খুল ইসলামের কথায় হার মানলেন। কারণ, তিনি উলামাদেরকে খুবই ভালোবাসতেন। সম্মান করতেন।

শায়খুল ইসলামের এ পদক্ষেপের ফলে খেলাফতের সংখ্যালঘুরা তাদের ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে আগের মতো স্বাধীন থেকে যায়। কেউ তাদের দিকে অনিষ্টের অঙ্গুলি সম্প্রসারণ করতে পারেনি।[৩৪]

৩৪. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-৫৮, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

Scanned by CamScanner

সুলতান প্রথম সালিমের তাকওয়া

সুলতান প্রথম সালিম ছিলেন উসমানি খেলাফতের একজন দক্ষ, রণকুশলী, ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহওয়ালা শাসক। মাত্র আট বছর শাসন পরিচালনা করে উসমানি খেলাফতকে বিশ্বের দরবারে একটি শক্তিশালী ও মজবুত সাম্রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলেন। মূলত তার যুগ থেকেই উসমানি না খেলাফত উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সকল ঐতিহাসিক তার সময়কালকেই উসমানি খেলাফতের উন্নতির যুগ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মিশর, হিজায ও শাম বিজয়ের মাধ্যমে উসমানি সালতানাতকে খেলাফতে রূপান্তরিত করেন। সে হিসেবে উসমানি খেলাফতের তিনিই প্রথম খলিফা। তার তাকওয়ার একটি ঘটনা আজও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। উসমানি খলিফা ও সৈন্যদের তাকওয়া কেমন ছিল, তাও জানা যায় এ ঘটনা থেকে।

খেলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুলের 'আবু আইয়ুব আনসারি রা. মসজিদে' দুরাকাত সালাত আদায় করলেন সুলতান। সালাত শেষে আসন্ন লড়াইয়ে বিজয়ের জন্য আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে মোনাজাত করলেন। মুসলিম উম্মাহর শৌর্য-বীর্য অটুট রাখার জন্য চোখের পানি ছেড়ে আল্লাহর দরবারে মিনতিপূর্ণ মোনাজাত করলেন। এরপর সৈন্যবাহিনীকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে 'উসকুদার' এলাকার দিকে রওয়ানা হলেন।

সুলতান প্রথম সালিমের নেতৃত্বে উসমানি সেনাবাহিনী ১৫১৬ সালের ৫ জুন 'উসকুদার' থেকে পূর্বদিকে দিকে যাত্রা শুরু করল। সেনাবাহিনী বিভিন্ন ধরনের ফলমূলে সুশোভিত বাগান-বিথীকার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিল। হরেক রকম থোকা থোকা পাকা ফলের মৌ মৌ গন্ধে মোহিত ছিল আশপাশ। নাসারন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করছিল পাঁচমিশালি সুঘ্রাণ। সে ঘ্রাণ আকুল করে তুলছিল প্রত্যেক সৈন্যকে। ইস্তাম্বুল থেকে ৭০ মাইল দূরে 'কাবজাহ' নামক স্থানে পৌঁছে যাত্রাবিরতি করল সেনাবাহিনী। সবাই বিশ্রাম নিচ্ছিল।

পুনরায় যাত্রা শুরুর আগে সুলতানের অন্তরে কেমন যেন একটা খটকা দেখা দিল! সেনাপ্রধানকে ডেকে আদেশ দিলেন,
'প্রত্যেক সৈন্যের ব্যাগপত্র চেক করে দেখা হোক, কোনো সৈন্য মালিকের অনুমতি ছাড়া বাগান থেকে কোনো ফল পেড়ে ব্যাগে ভরেছে কি না।'

Scanned by CamScanner

সেনাপ্রধান সুলতানের তাবু থেকে বেরিয়ে লোকজনের সাহায্যে প্রত্যেক সৈন্যের ব্যাগ তন্ন তন্ন করে তালাশ করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়; ফেলে আসা বাগানের গাছগুলোও যাচাই করে দেখলেন–সেখানে ফল আহরণের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় কি না; কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

সেনাপ্রধান সুলতানকে এসে জানালেন,

'কিছুই মিলেনি।'

কথাটা শুনে সুলতানের ঠোঁটে মুচকি হাসি খেলে গেল। আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বললেন,

'মাওলা! সকল প্রশংসা তোমার, আমাকে এমন একটি সেনাদল দান করেছ, যারা তোমার সন্তুষ্টি তালাশ করে। যারা হারাম খায় না, কারও সম্পদে হাত দেয় না।'

অতঃপর সেনাপ্রধানকে লক্ষ করে বললেন,

'আগা! যদি মালিকের অনুমিত ছাড়া বাগান থেকে ফল আহরণ করেছে এমন কোনো সৈন্য পাওয়া যেত, তাহলে আমি এই অভিযাত্রা ফিরিয়ে নিতে মোটেও দ্বিধা করতাম না! যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করতাম না!'

অতঃপর তিনি বলেন, 'আগা! যে সেনাদল মালিকের অনুমতি ব্যতীত তার বাগানের ফল পেড়ে খায় এমন সেনাদল নিয়ে কোনো অঞ্চল বিজয় করা একেবারে অসম্ভব'[৩৫]

---

৩৫. খাওয়াতিরু উসমানিয়্যাহ-৬৩, আবদুল করিম ইজ্জুদ্দিন।

Scanned by CamScanner

হাকিমুল হারামাইন নই; খাদিমুল হারামাইন

সুলতান প্রথম সালিম রূঢ় ও কঠিন স্বভাবের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি ছিলেন আল্লাহওয়ালা, নিভৃতচারী ও বিনয়ী শাসক। খেলাফতে আব্বাসিয়া উত্তর মিশরের মামলুক সালতানাত মিশর, শাম ও হেজায শাসন করত। সুলতান প্রথম সালিম বিশৃঙ্খল মামলুক সালতানাতের পতন ঘটিয়ে মিশর, শাম ও হেজাযকে উসমানি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে একটি পতাকার নিচে নিয়ে আসেন। তার যুগ থেকেই উসমানি সালতানাত খেলাফতে রূপান্তরিত হয়। তিনিই ছিলেন প্রথম উসমানি খলিফা।

সুলতান প্রথম সালিম উসমানি খেলাফতের মসনদে সমাসীন হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই মুসলিম বিশ্বের দিকে দিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। জামে মসজিদের খতিবগণ জুমআর খুতবায় তার নাম 'হাকিমুল হারামাইন' বলে উচ্চারণ করতে শুরু করেন। কিন্তু সুলতান এই উপাধি পছন্দ করতেন না।

একদিন তিনি শামের রাজধানী দামেশকের জামে মসজিদে জুমআর নামাজ আদায়ের জন্য উপস্থিত হলেন। মিম্বরের ঠিক সামনে প্রথম কাতারেই বসেছিলেন সুলতান। তার ডানে-বামে ছিলেন মন্ত্রী, কমান্ডার আর শামের উলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিজয়ের পর এটাই ছিল তার শামে আদায়কৃত প্রথম সালাতুল জুমআ।

কুরআন তেলাওয়াত ও নফল নামাজ আদায়ের পর ইমাম সাহেব খুতবা দেয়ার উদ্দেশে মিম্বরে আরোহণ করলেন। সদ্য বিজিত শামের মাটিতে জুমআর খুতবায় এই প্রথম সুলতান প্রথম সালিমের নাম উচ্চারিত হবে। ইমাম সাহেব খুতবা দিতে শুরু করলেন। তিনি খুতবার মধ্যে এই বলে দোয়া করতে লাগলেন–'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সুলতান সালিমকে সাহায্য করুন... জল-স্থলের সুলতান...হাকিমুল হারামাইন...'

সুলতান মাথা নিচু করে আনমনে খুতবা শুনে যাচ্ছিলেন। কিন্তু 'হাকিমুল হারামাইন' শব্দটা শোনার সাথে সাথে তার গা শিউরে উঠল। তিনি শশব্যস্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'না! না! আমি 'হাকিমুল হারামাইন' নই; বরং আমি 'খাদিমুল হারামাইন'। আপনি খুতবার ভাষা পরিবর্তন করুন!'

সাথে সাথে খতিব সাহেব ভুল শুধরিয়ে সুলতানের নির্দেশিত উপাধিটা উচ্চারণ করলেন। নামাজ শেষে সুলতান তার পরিধেয় 'কুফতান' (লম্বা হাতাঅলা ঢিলে জুব্বা)-টি খতিব সাহেবকে শোকরানা হিসেবে হাদিয়া দিয়ে দিলেন।[৩৬]

---

৩৬. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-৬৩, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

Scanned by CamScanner

কাদাযুক্ত কুফতান কফিনে ভরে দেয়ার অসিয়ত

সুলতান প্রথম সালিম মিশর বিজয় করে ইস্তাম্বুলে ফিরছিলেন। মিশর, শাম ও হেজায অধিকার করে তিনি এখন খলিফাতুল মুসলিমিন। আলে উসমানের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন প্রথম খলিফা। সালতানাতকে খেলাফতে রূপদাতা। চলছিলেন শাহি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে। পাশে ছিলেন তৎকালীন বড় আলেম ও বুযুর্গ আল্লামা ইবনে কামাল। গল্পে গল্পে এগিয়ে চলছেন উভয়। তাদের পেছনে হাঁটছেন খেলাফতের মন্ত্রীবর্গ, কমান্ডারগণ আর সেনাবহর।

সুলতান ও আল্লামা ইবনে কামাল গল্প করে এগিয়ে চলছেন। হঠাৎ করে আতঙ্কিত হয়ে উঠল আল্লামা ইবনে কামালের ঘোড়া! খুর দিয়ে কাদামাটি ছিটিয়ে নষ্ট করে দেয় খলিফার পরনের 'কুফতান'! পুরো 'কুফতান' জুড়ে কাদামাটির ছোপ ছোপ দাগ!

ঘাবড়ে যান আল্লামা ইবনে কামাল! চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। মৃত্যু নিশ্চিত মনে করে নেন তিনি। পেছনের মন্ত্রী, কমান্ডার আর সৈন্যরাও অপেক্ষার প্রহর গুনছেন, কখন আল্লামার মাথার খুলি উড়িয়ে দেয় সুলতানের ধারালো তরবারি।

কিন্তু না, সুলতান অত্যন্ত শান্তভাবে দেহ থেকে টেনে খুলে নেন কুফতান। আরেকটি নতুন কুফতান নিয়ে আসার আদেশ দিয়ে আল্লামা ইবনে কামালকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

'আপনার মতো একজন বড় আলেমের ঘোড়ার খুর তেকে আমার কাপড়ে যে কাদার ছিটা লেগেছে তা আমার কাছে এক অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত। ইনশাআল্লাহ আমি অসিয়ত করে যাব, মৃত্যুর পর দাফনের সময় যেন এ 'কুফতান'টি আমার কফিনের ভেতর রাখা হয়।'

বাস্তবেই খেলাফতের লোকজন তার এই অসিয়ত পূর্ণ করেছিলেন। তারা তার কফিনের ভেতর কর্দমাক্ত 'কুফতান'টি রেখে কবরে দাফন করেছিলেন।[৩৭]

---

৩৭. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-৬১, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

Scanned by CamScanner

নাঙ্গা কৃপাণ

সুলতান প্রথম সালিম আড়ম্বরতা ও জাঁকজমক একদম পছন্দ করতেন না। রাজকীয় পোশাকও পরতেন না। সবসময় স্বাভাবিক মানের পোশাক পরিধান করতেন। পুরনো হয়ে গেলে পারতপক্ষে নতুন জামা পরিধান করতেন না। কারও এমন সাহসও ছিল না যে বলবে, পুরনো কাপড়টা পাল্টিয়ে নতুন কোনো জামা পরে নিন। তার জীবনযাপন ছিল একজন সাধারণ মানুষের মতো। মন্ত্রীরা তার সম্মানার্থে তার উপস্থিতিতে দরবারে উন্নতমানের পোশাক পরে হাজির হতেন না। তারাও দরবারে সুলতানের মতোই পুরনো ও নিম্নমানের পোশাক পরেই হাজির হতেন। সেই হিসেবে সুলতানের রাজদরবার হয়ে গিয়েছিল আড়ম্বরতা, রাজকীয় জাঁকজমক ও লৌকিকতা মুক্ত।

একবার খবর আসল, কূটনৈতিক সম্পর্কের বার্তা নিয়ে দরবারে আসছেন এক ইউরোপিয়ান দূত। মোক্ষম উপলক্ষ পেয়ে গেলেন উজিরে আজম। তিনি দূতের আগমনবার্তা নিয়ে উপস্থিত হলেন সুলতানের দরবারে। সুলতানকে উদ্দেশ্য করে বিনয়াবনত কণ্ঠে বললেন, 'জাঁহাপনা! আমাদের শত্রুরা কম বুদ্ধিসম্পন্ন। তারা কৃত্রিমতাকে পছন্দ করে। বাহ্যিক বেশভূষাকে বেশি প্রাধান্য দেয়। সে হিসেবে সমীচিন হল...

উজিরে আজমকে থামিয়ে দিয়ে সুলতান শশব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, বুঝেছি। আর বলতে হবে না। আমি এটা বিবেচনা করব। আমি ওই দিন ভালো কাপড় পরে নেব। আর আপনারাও আপনাদের জন্য উত্তম কাপড় নির্বাচন করে রাখবেন। দামি পোশাক পরে নিবেন।'

মন্ত্রীরা সবাই খুশি। ইউরোপীয় দূত আগমন উপলক্ষে তাদের সবচেয়ে সুন্দর ও দামি পোশাকটা পরলেন। মনে মনে ভাবলেন, নিশ্চয় সুলতানও অত্যন্ত শানদার পোশাক পরবেন। এতে তারাও মোটামুটিভাবে সুলতানের সাথে পাল্লা দিয়ে সৌন্দর্যে শরিক হতে পারবেন।

দূত আসার আগেই সুলতান মসনদে টেক লাগিয়ে একটি নাঙা কৃপাণ রাখার আদেশ দিলেন। কথামতো তা-ই করা হল। সব আয়োজন সম্পন্ন। একটু পরই আগমন করবে ইউরোপীয় দূত। তার আগে রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করবেন সুলতান। রাজদরবারে মন্ত্রীবর্গ আর খেলাফতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ জাঁকজমকপূর্ণ পোষাকে বসে সুলতানের আগমনের অপেক্ষা করে

Scanned by CamScanner

চলছেন। তারা আশা করছেন, আজ নিশ্চয় সুলতান অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পোষাকে তাদের সামনে আগমন করে উসমানি খেলাফতের মসনদ অলঙ্কৃত করবেন। কিন্তু না, সুলতান তার চিরাচরিত সেই পুরনো পোশাকেই আগমন করলেন! গুরুগম্ভীর ভাব নিয়েই মসনদে সমাসীন হলেন! অবস্থা দেখে মন্ত্রীরা তো ভয়ে কম্পমান! লজ্জায় তাদের থুতনি বুক ছুঁতে শুরু করল। আজকের মতো একটা স্মরণীয় দিনে তাদের পোশাকের চেয়ে সুলতানের পোশাক নিম্নমানের-বিষয়টা ভাবতেই তাদের কেমন যেন লাগছিল। কী আর করা, সকলেই লজ্জায় মস্তকাবনত হয়ে বসে রইলেন।

ইউরোপীয় দূত এসে উপস্থিত হল। রাজদরবারে প্রবেশের সময় সুলতানকে যথাযথ সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক কুর্ণিশ করে দাঁড়িয়ে রইল। সকলেই প্রত্যক্ষ করলেন, দূত মৃগী রোগীর ন্যায় থরথর করে কাঁপছে! সুলতানের সাথে সামান্য কিছু বাক্য বিনিময়ের পরই দূত তড়িৎ রাজদরবার ত্যাগ করল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, সে কোনোরকম জীবন নিয়ে পলায়ন করতে পেরেছে! সুলতান মন্ত্রীদেরকে আদেশ করলেন, তারা যেন দূতের কাছে গিয়ে সুলতানের পোশাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আদেশানুসারে মন্ত্রীরা দূতের পিছু নিয়ে কৌশলে সুলতানের পোশাক সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলেন। দূত তখন উত্তরে বলছিল–

'আমি সুলতানকে দেখিনি। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে রেখেছিল মসনদের উপর ঠেক লাগানো ওই নাঙা তরবার! আমি ওটা ছাড়া আর কিছুই দেখিনি!'

ফিরে এসে মন্ত্রীরা যখন সুলতানকে রিপোর্ট শোনালেন। তখন সুলতান মসনদের উপর ঠেক লাগানো নাঙা কৃপাণের দিকে ইঙ্গিত করে তাদের উদ্দেশ্য করে ঐতিহাসিক যে কথাটি বলেছিলেন, তা আজও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। সুলতান বলেছিলেন–

'যতোদিন পর্যন্ত আমাদের তলোয়ার ধারালো থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত শত্রুরা আমাদের বেশভূষা আর বাহ্যিকতার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না এবং এসবের প্রতি নজরও দেবে না। আল্লাহ সেদিন যেন আমাদের না দেখান, যেদিন আমাদের তলোয়ার ধারহীন হয়ে পড়ে থাকবে আর আমরা আমাদের বেশভূষা, বাহ্যিকতা নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ব।'[৩৮]

---

৩৮. আত তারিখুস সিররিয়্যা লিল ইমবারাতুরিয়্যাতিল উসমানিয়্যাহ-৬৪, মুস্তফা আরমাগান।

Scanned by CamScanner

খলিফার অবাক করা বিনয়

সুলতান প্রথম সালিম মিশর পদানত করে শাম, ফিলিস্তিন, দক্ষিণ ইরাক ও হিজাজভূমি উসমানি খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত করে ফিরে আসছেন রাজধানী ইস্তাম্বুলে। রাজধানীর কাছে আসতেই জানতে পারেন, ইস্তাম্বুলের অধিবাসীরা তার বিজয় কেতন উড়িয়ে প্রতিদিন রাজপথে জড়ো হয় অভিবাদন জানানো এবং প্রিয় সুলতানকে বিজয়ীর বেশে দেখার আশায়। তারা চায়, ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিতে। কারণ, মিশর বিজয় ছিল ওসমানি সালতানাতের জন্য তার এক অসামান্য অবদান।

খবরটি শুনেই সুলতানের হৃদয় কুকড়ে যায়! সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন, তার পক্ষ থেকে দ্বিতীয় কোনো নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত তারা যেন এশীয় অংশে ছাউনি ফেলে অবস্থান নেয়। তারা যেন এখন ইস্তাম্বুলে প্রবেশ না করে। তখন ইস্তাম্বুল ছিল ইউরোপীয় অংশে।

মন্ত্রী, কমান্ডার আর সেনারা সুলতানের নির্দেশ শুনে হয়রান হয়ে গেলেন। এ নির্দেশের কোনো কারণ তাদের বোঝে আসছিল না। আবার কারো এমন বুকের পাটা ছিল না যে, এ ব্যাপারে সুলতানকে কিছু জিজ্ঞেস করবে। তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবে।

অপরদিকে ইস্তাম্বুল শহর একেবারে নাকের ডগায়। শহরে প্রবেশ করতে বেশি থেকে বেশি দেড় বা দুই ঘণ্টা সময় লাগার কথা। সকলেই নিজ নিজ ঘরে ফেরার জন্য অধীর আগ্রহী। তাদের পরিবার-পরিজনও অপেক্ষার প্রহর গুনে চলছে। ব্যাকুল ইস্তাম্বুলের অধিবাসীরাও। তবুও কেন এই বিলম্বের নির্দেশ? কী উদ্দেশ্য সুলতানের?

মন্ত্রী, কমান্ডার আর সেনারা অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করে যাচ্ছেন। সবার আশা নিশ্চয় সুলতান তার একরোখা সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনবেন। তাদেরকে ইস্তাম্বুলে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করবেন। কিন্তু না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। সূর্য পশ্চিমাকাশে ডুবতে বসেছে; তবুও সুলতানের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনো আলামত নেই! আর এ ব্যাপারে সুলতানকে জিজ্ঞেস করবে এমন সাহসও কারও নেই।

Scanned by CamScanner

মন্ত্রী আর কমান্ডারগণ পরামর্শে বসলেন। তারা সুলতানের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করার জন্য 'আল্লামা ইবনে কামাল'র কোনো বিকল্প খুঁজে পেলেন না। সুলতান ইবনে কামালকে খুবই সম্মান করতেন। মানতেন। ভালোবাসতেন।

তারা আল্লামা ইবনে কামালের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করলেন। ইবনে কামাল কথা রাখলেন। সুলতানের সাথে আলাপ করার মতো ভারি বিষয়টাকে তিনি কাঁধে বহন করে নিলেন।

আল্লামা ইবনে কামাল সুলতানের তাবুতে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। সুলতান অনুমতি প্রদান করলেন। ইবনে কামাল সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে বিনয়ের সাথে বললেন, মুহতারাম সুলতান! একটা কথা বলার জন্যে আপনার দরবারে এসেছিলাম!

-বলুন!

-জাঁহাপনা! আপনার সেনাবাহিনী হয়রান হয়ে আছে, তারা জানতে চাচ্ছে আপনি কেন ইস্তাম্বুলে প্রবেশ থেকে বিরত রয়েছেন? অথচ ইস্তাম্বুলবাসী আপনাকে এবং আপনার বিজয়ী সেনাবহরকে শুভেচ্ছা জানাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে!

সুলতান তখন যে জবাব দিয়েছিলেন, ইতিহাস তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছে যুগের পর যুগ ধরে।

সুলতান বলছিলেন,

'ইবনে কামাল! আপনি আমাকে এখনও চিনতে পারেননি? আমি তো যশ-খ্যাতি ও শুভেচ্ছা কুড়ানোর জন্য যুদ্ধ করি না। আমি তো যুদ্ধ করি আল্লাহর রাস্তায়। একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে।'

এরপর রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসলে সেনাবহরকে ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করার আদেশ দিয়ে নিজে কতিপয় দেহরক্ষী সাথে নিয়ে একটি নৌকায় চড়ে বসলেন। ইস্তাম্বুল শহরে প্রবেশ করেই মহলের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইস্তাম্বুলের একটি টিকটিকি পর্যন্ত তার আগমনের খবর জানতে পারেনি।[৩৯]

---

৩৯. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানিয়্যাহ-৬৫, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

Scanned by CamScanner

সুলতানও খালি হাতে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন

সুলতান সুলায়মান (১৫২০-১৫৬৬)। সুলতান প্রথম সালিমের সুযোগ্য সন্তান। ১৪৯৫ সালে টারাবজুন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সুলতান সুলায়মান শাহজাদা থাকা কালে খুবই আড়ম্বরপূর্ণ ও বিলাসী জীবনযাপন করতেন। পিতার মৃত্যুর পর যখন উসমানি খেলাফতের মসনদে আসীন হন তখন পশ্চিমারা ছিল খুবই খুশি। তারা মন্তব্য করছিল, উসমানি খেলাফতের শার্দূল মারা গেছে; তার জায়গায় উত্তরাধিকারী হয়েছে একটি ভেড়া।

কিন্তু সময়ের ব্যবধানে পাল্টে যান সুলায়মান। আগের শাহজাদা সুলায়মান হয়ে যান সুলতান সুলায়মান কানুনি। উসমানি খেলাফতের দ্বিতীয় খলিফা। একেবারে পিতার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। পিতার মতোই অত্যন্ত কঠিন প্রকৃতি ও রূঢ় স্বভাবের অধিকারী। উসমানি খেলাফতের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী ও প্রতাপশালী শাসক। পঁয়তাল্লিশ বছর খেলাফত পরিচালনা করেন। একাধারে দশ বছর ঘোড়ার পিঠে জীবন কাটিয়েছেন বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে। তেরোটি যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। ছিলেন একজন আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ। মদিনাওয়ালার খাঁটি প্রেমিক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যার স্বপ্নযোগে দেখা হয়েছে বেশ কয়েকবার। খেলাফতের প্রধান মুফতি, তাফসিরে আবুস সাউদ এর লেখক, শায়খুল ইসলাম আল্লামা আবুস সাউদ আফেন্দি রাহ.'র ফাতওয়া ছাড়া একটি আইনও জারি করতেন না তিনি ।

তিনিই উসমানি খেলাফতের আইন-কানুন ঢেলে সাজান নতুনভাবে। একটি কানুননামা বা সংবিধান রচনা করেন সম্পূর্ণ ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক। সে আইনগুলো খেলাফতে নবপ্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছিল। উসমানি খেলাফতকে একটি আদর্শ, মজবুত ও সফল সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিল। কানুননামার প্রতিটি আইনকে অক্ষরে অক্ষরে প্রয়োগ করতেন তিনি। এজন্য তার উপাধি হয় 'কানুনি'। তার সুদক্ষ সাম্রাজ্য পরিচালনায় মুগ্ধ হয়ে ইউরোপীয়রা তাকে উপাধি দিয়েছিল 'দ্য সুলায়মান মেগনিফিসেন্ট গ্র্যাট'।

তিনি ছিলেন ক্রুসেডারদের সাক্ষাৎ যমদূত। তার নাম শোনামাত্রই পশ্চিমা শাসকরা কাঁপতে শুরু করত মৃগী রোগীর মতো। ইউরোপের মাটিতে উসমানি খেলাফতের সীমানা তিনিই সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত করেছিলেন। তার শাসনামলেই ইউরোপে ইসলামের শিকড় সবচে' বেশি প্রোথিত হয়েছে। তিনি

Scanned by CamScanner

উসমানি খেলাফতের সীমানা দক্ষিণপূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া, ককেশাস, উত্তর আফ্রিকা ও হর্ন অব আফ্রিকা জুড়ে বিস্তৃত করেছিলেন। তিনিই পৌঁছে দিয়েছিলেন উসমানি খেলাফতকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে। সুদীর্ঘকাল ধরে ইউরোপীয় সম্রাটদের ভৃত্যের বানিয়ে রেখেছিলেন সুলতান সুলায়মান। তার শাসনামলে ইউরোপীয় সম্রাটদের ভেড়ার মতো জীবনাতিপাত করতে হয়েছে।

সর্বোপরি 'সুলতান সুলায়মান কানুনি' নামটি ছিল গোটা ইউরোপের জন্য একটি ত্রাস! একটি আতঙ্ক! তাই ইউরোপীয়রা তার নাম সহ্য করতে পারতো না। আজও পারে না। সুলতান সুলায়মান কানুনির প্রতি তাদের বিদ্বেষ কতোটুকু ছিল, তা অনুমান করা যায় পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের লিখিত বানোয়াট ও মনগড়া ইতিহাস পড়ে। তারা সুলতান সুলায়মান কানুনির ব্যক্তিত্ব কলুষিত করতে এমনসব জঘন্য মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে, যা স্বয়ং তাদেরই স্বজাতি ন্যায়নীতিবান পণ্ডিত ও মনীষীদের ভাষ্যের বিরোধী হয়ে গেছে! বাস্তবতা আর সত্যতা তো বহুত দূর কি বাত!

এখানে সুলতান সুলায়মান কানুনির দ্বীনদারি ও তার সাম্রাজ্য পরিচালনায় দ্বীনদারিত্বের প্রভাব কতোটুকু ছিল, তা একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি।

সুলতান সুলায়মানের কানুননামার একটি আইন ছিল–খেলাফতের 'উজিরে আজম' অথবা সাধারণ উজির হতে হলে অবশ্যই নির্ধারিত ওয়াক্তে নামাজ আদায়কারী হতে হবে। অন্যথায় তিনি হবেন এই পদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত!

তিনি ছিলেন ইলমপিপাসু, বহু ভাষাবিদ ও কবি। আলেম-উলামাদের ভালোবাসতেন। ছিলেন রহমদিল ও ন্যায়নীতিবান। নিজ হাতে পবিত্র কুরআন কারিমের আটখানা কপি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেগুলো আজও 'মসজিদে সুলায়মানিয়্যায়' সংরক্ষিত রয়েছে।

মৃত্যুকালে তার অসিয়ত ছিল, 'কফিনের ভেতর থেকে আমার একটি হাত বের করে রাখবে, যাতে মানুষ এটা বুঝতে পারে যে, স্বয়ং সুলতানও খালি হাতে এই দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর পর তার জানাযার নামাজে এতো বেশি লোকের সমাগম হয়েছিল যে, পাঁচশ জন মুকাব্বিরের প্রয়োজন পড়েছিল![৪০]–

৪০. জাওয়ানিবু মুজিআতুন ফি তারিখিল উসমানিয়্যিনাল আতরাক-২৬, জিয়াদ আবু গুনাইমাহ।
*আল খিলাফাতুল উসমানিয়্যাহ-৩১৪, আবদুল মুনইম হাশিমি।

Scanned by CamScanner

ইয়াহুদির কুঁড়েঘরে সুলতান সুলায়মান

সুলতান সুলায়মানের বড় ইচ্ছা, খেলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুলে একটি সুবিশাল নয়নাভিরাম মসজিদ নির্মাণ করবেন। যেটি হবে তার বাপ-দাদার প্রতিষ্ঠিত মসজিদগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার একান্ত ইচ্ছে ছিল, গগনচুম্বী, চিত্তাকর্ষক বিশাল এ মসজিদটি ইস্তাম্বুলের সবচেয়ে অভিজাত স্থানে হবে।

খোঁজা শুরু হলো যুৎসই একটি জায়গা। বেশ কিছু জায়গা পাওয়া গেল সুলতানের মনোবাঞ্ছানুযায়ী। তন্মধ্যে সুলতানের পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচন করা হল একটি জায়গা। তবে ওখানে যে সমস্যা দেখা দেয় তা হচ্ছে নির্বাচিত সে জায়গার মাঝখানে ছিল জনৈক ইয়াহুদির একটি কুঁড়েঘর। সেখানে মসজিদ নির্মাণ করতে হলে কুঁড়েঘরটি ভেঙে ফেলার বিকল্প কোনো উপায় ছিল না।

খেলাফতের লোকজন ইয়াহুদি ব্যক্তির ছোট্ট কুঁড়েঘরের দরজায় করাঘাত করলেন। ঘরের মালিক বের হয়ে এল। অপরিচিত লোকদেরকে দেখে বলল, স্বাগতম ... কী ব্যাপার, আমার এ ভাঙা কুটিরের সামনে কেন?

-আমরা সুলতানের লোক। সুলতানের নির্দেশানুযায়ী মসজিদ নির্মাণের জন্য একটি জায়গা খুঁজে চলছি।

-ভালো। আমি এ ব্যাপারে কী সাহায্য করতে পারি? আমি তো মিস্ত্রি নই!

-ব্যাপার তা নয়। ব্যাপার হচ্ছে দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার কুঁড়েঘরটি মসজিদ নির্মাণের জন্য নির্বাচিত জায়গার মাঝখানে পড়ে গেছে। তাই আমরা আপনাকে ঘরটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবার অনুরোধ করতে এসেছি।

-আপনারা কি আমার ঘরটি ভেঙে ফেলতে চান?

-না, আমরা ঘরটি আপনার কাছ থেকে খরিদ করব। আপনি কত টাকার বিনিময়ে আমাদের কাছে বিক্রি করবেন?

-দুঃখিত, আমি ঘরটি বিক্রি করতে চাই না!

-আমরা আপানাকে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করব, আপনি ওই মূল্য দিয়ে অন্যত্র এর চেয়ে উত্তম আরেকটি ঘর খরিদ করতে পারবেন।

-না! হবে না! আমি বিক্রি করব না। আমাকে লোভ দেখাবেন না! এই কুঁড়েঘর নিয়েই আমি সন্তুষ্ট। আমার ঘরটি ছোট্ট কুঁড়ে হলেও এটি শহরের সবচেয়ে সুন্দর ও নৈসর্গিক জায়গায় অবস্থিত। বিশেষ করে নদীর কিনারে।

-আমরা আপনাকে বিদ্যমান মূল্যের চেয়ে দ্বিগুণ মূল্য দিতে রাজি।

-অযথা লোভ দেখাবেন না; আমি আমার ঘর বিক্রি করব না। বড় কথা হলো ঘরটি আমার কর্মক্ষেত্রের খুব নিকটে।

Scanned by CamScanner

খেলাফতের লোকজন লোকটির সাথে কথা বলে লাভ নেই ভেবে সুলতানের দরবারে ফিরে আসল। এসে বলল, মহামান্য সুলতান! আপনার পছন্দসই জায়গাটির মাঝখানে জনৈক ইয়াহুদির একটি কুঁড়েঘর অবস্থিত। আমরা তাকে কুঁড়েঘরটি দ্বিগুন মূল্যে দেওয়ার কথা বললেও সে বিক্রয়ে রাজি হচ্ছে না! এমতাবস্থায় শাহি ফরমান জারি হওয়া ছাড়া বিকল্প পথ নেই। ফরমান জারি হয়ে গেলে আমরা তাকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেব।

সুলতান নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়িয়ে বললেন, এটা হয় না! এটা আমাদের বৈশিষ্ট্য নয়। আমাদের দ্বীন কাউকে জুলুম করতে অনুমতি দেয় না; আমাদেরকে একটা সমঝোতায় পৌঁছতে হবে।

মসজিদ নির্মাণের বিষয়টি শরয়ি সমাধানের উপর আটকে থাকে। শেষপর্যন্ত বিষয়টি সমাধানের জন্য সুলতান শায়খুল ইসলামের শরাণাপন্ন হন। শায়খুল ইসলাম বলেন, 'মহামান্য সুলতান! ইসলামের হুকুম পরিষ্কার! ইয়াহুদি ব্যক্তিকে তার ঘর বিক্রি না করার দরুণ কোনো শাস্তি দেয়া যায় না। কারণ, কুঁড়েঘরটি তার মালিকানাধীন বস্তু। তার মৃত্যুর পর এটি তার সন্তানাদির উত্তরাধিকারে চলে যাবে। সমাধানের একটিমাত্র পথই খোলা। পথটি হল যেমন করেই হোক ইয়াহুদিকে বিক্রয়ে রাজি করিয়ে নিতে হবে।'

সুলতান সুলায়মান কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আমি নিজেই যাব ইয়াহুদির কাছে তার ঝুঁপড়িটি খরিদ করার জন্যে।'

সত্যিই সুলতান ঘোড়ায় চড়ে হাজির হলেন ইয়াহুদি কুঁড়ে ঘরে। ঘোড়া থেকে নেমে ইয়াহুদির কুঁড়েঘরের দরজায় করাঘাত করলেন। ইয়াহুদি দরজা খুলে সুলতান ও তার লোকজনকে দেখে হতবাক! কিছুটা শঙ্কিতও।
সুলতান বিনয়ীভাবে তাকে কুঁড়েঘরটি আগের চেয়ে আরও অধিক মূল্যে বিক্রির প্রস্তাব দেন। ইয়াহুদি লোকটির মানবতা সুলতানকে ফিরিয়ে দিতে পারল না। রাজি হয়ে গেল লোকটি। সম্পাদিত হয়ে গেল বিক্রয় চুক্তি।
এরপর সেখানে নির্মিত হল ইস্তাম্বুলের সবচেয়ে বড়, জাঁকজমকপূর্ণ, নয়নাভিরাম ও চিত্তাকর্ষক 'সুলায়মানিয়্যা জামে মসজিদ'। যেটি আজও ইসলামি নির্মাণশিল্পের এক অনন্য উদাহরণ।
মসজিদটি নির্মাণে সুলতান সুলায়মানের ব্যবহার ইসলামের মহানুভবতা ও ন্যায়পরায়ণতার এক নজিরবিহীন দলিল হয়ে থাকবে। কখনও ইস্তাম্বুলে গেলে 'সুলায়মানিয়্যা জামে মসজিদ' দেখে আসতে ভুল করবেন না।[৪১]

---

৪১. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-৮৪, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

Scanned by CamScanner

ফ্রান্সের বন্দি রাজা ও তার মায়ের ফরিয়াদ

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত 'পাভিয়া'র যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর ফ্রান্স সম্রাট 'প্রথম ফ্রান্সিস' বন্দি হন জার্মান সম্রাট 'পঞ্চম চার্লস হ্যাবসবুর্গ'র হাতে। বন্দি হওয়ার পর 'সম্রাট ফ্রান্সিস' ও তার মা 'ড্যানিজু' উভয়েই তৎকালীন বিশ্বের প্রতাপশালী শাসক সুলতান সুলায়মানের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি প্রেরণ করেন। পত্রে জার্মান সম্রাটের বন্দিশালা থেকে উদ্ধারের জন্য সুলতান বরাবরে সাহায্যের বিনীত আবেদন জানান ফ্রান্স অধিপতি। রাষ্ট্রদূত জেন ফ্রাঙ্গিপানি চিঠি দুটি নিয়ে হাজির হন সুলতান সুলায়মানের দরবারে।

চিঠি দুটির মধ্যে ফ্রান্স সম্রাটের মায়ের চিঠির ভাষা ছিল বেদনামাখা। চিঠির সারসংক্ষেপ ছিল—

'এতোদিন পর্যন্ত আমি আমার ছেলের মুক্তির ব্যাপারে সম্রাট চার্লস হাবসবুর্গের ইনসাফ ও করুণার উপর নির্ভরশীল ছিলাম। কিন্তু আমার আশা দুরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। জালেমটি আমার ছেলেকে অহর্নিশ নির্যাতন করে যাচ্ছে। যেহেতু পুরো দুনিয়া আপনাদের বড়ত্ব, মহত্ব, প্রতিপত্তি ও যশ-খ্যাতি জানে, সেহেতু হে মহান সুলতান! আমি আমার ছেলেকে উদ্ধার ও মুক্ত করতে আপনার সাহায্য কামনা করছি।'

দরবারের ভাষান্তরকারী সুলতানের সমীপে চিঠি বক্তব্য বুঝিয়ে দিলে তিনি দরবারের ব্যক্তিবর্গ ও উজিরদের লক্ষ করে বললেন,
'পুত্রের বিয়োগব্যথায় এক অসহায় জননীর অন্তরের ব্যাকুলতা আপনারা অনুভব করতে পারছেন'?

এরপর সুলতান কাতিবকে ডেকে চিঠি দুটির আলাদা দুটি উত্তর লেখালেন। একটি বন্দি ফ্রান্স সম্রাটের কাছে। অপরটি সম্রাটের মায়ের কাছে। ফ্রান্স সম্রাটের কাছে প্রেরিত চিঠির সারসংক্ষেপ ছিল—

"প্রাদেশিক ভূখণ্ড ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিসের প্রতি!
আপনার চিঠি দূত 'ফ্রাঙ্গিপানি'র মাধ্যমে উসমানি খেলাফতের দরবারে পৌঁছেছে। চিঠি থেকে জানতে পারলাম, শত্রুরা আপনাদের দেশে হানা দিয়ে আপনাকে বন্দি করে নিয়ে গেছে।

Scanned by CamScanner

> আর আপনি মুক্তির জন্যে আমাদের সাহায্য কামনা করছেন। পরাজিত সম্রাটকে বন্দি করা আশ্চর্যজনক কিছু নয়। আপনি চিন্তিত হবেন না। কেননা আমাদের অশ্ব ও তরবারি দিবস-রজনী প্রস্তুত হয়ে আছে আপনার আশা পূরণে।"

গভীর দৃষ্টিতে খেয়াল করলে বোঝা যায়, সুলতান সুলায়মান ফ্রান্সকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো রাষ্ট্র সাব্যস্ত করেননি; বরং উসমানি খেলাফতের প্রাদেশিক ভূখণ্ড হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

সুলতান সুলায়মান তার চিঠির কথা ফাঁস করতে চাননি। যুদ্ধ করার ইচ্ছাও ব্যাক্ত করেননি। তিনি জানতেন, তখন গোটা খ্রিস্টজগত উসমানি খেলাফতের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি নীরবে সে ক্রুসেড মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পূর্ণ প্রস্তুতির পর সেনাবাহিনীকে নিয়ে হাঙ্গেরির দিকে রওয়ানা হন। সেখানে গোটা ইউরোপের খ্রিস্টানরা জড়ো হয়েছে ক্রুসেডের লক্ষ্যে। সেই ক্রুসেডে শরিক ছিল হাঙ্গেরি, জার্মানি, ইটালি, স্পেন, যুগোস্লোভিয়া, পোল্যান্ডসহ আরো ক'টা দেশ। এ যুদ্ধে ভ্যাটিক্যানের পোপও তার সৈন্য নিয়ে শরিক ছিল। ১৫২৬ সালে 'মুহাক্স যুদ্ধ' নামে ঐতিহাসিক এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে বিজয় লাভ করে উসমানি বাহিনী।

শোচনীয় পরাজয়ের পর জার্মান সম্রাট পঞ্চম চার্লস হ্যাবসবুর্গ ইউরোপে উসমানি খেলাফতের ভূমি দখলের স্বপ্ন বিসর্জন করে। এরপর বন্দি ফ্রান্স সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিসকে মুক্ত করে দেয়।[৪২]

৪২. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-৮১, উরখান মুহাম্মাদ আলি। *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ-২৬৬, ইয়ালমাজ অজতোয়ানা।

Scanned by CamScanner

আঙুর লতায় ঝুলন্ত টাকা

সুলতান সুলায়মানের নেতৃত্বে অস্ট্রিয়ায় কোনো এক অভিযানে একের পর এক অমুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম পাড়ি দিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে উসমানি বাহিনী। এক গ্রামে ফলেফুলে সুশোভিত নয়নাভিরাম একটি বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে থোকা থোকা ঝুলন্ত আঙুর দেখে এক সৈন্য লোভ সংবরণ করতে পারেনি। খোঁজাখুঁজি করে বাগানের মালিককে না পেয়ে কেটে নেয় এক থোকা আঙুর আর সেখানে মূল্য বাবদ ঝুলিয়ে রেখে আসে কিছু টাকা।

ক্লান্ত সুলতান একটু জিরিয়ে নেয়ার জন্যে যাত্রাবিরতি দিয়ে পথিমধ্যে কোথাও থামলেন। এ সময় সেখানে এসে উপস্থিত হয় গ্রামের একজন খ্রিস্টান। সুলতানকে সম্বোধন করে বলে,

'জাঁহাপনা! আপনার কোনো এক সৈন্য আমার বাগানের এক কাঁদি আঙুর কেটে নিয়ে যথাস্থানে কিছু টাকা রেখে এসেছে। আমি এ ব্যাপারে আপনাকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।'

সুলতান তৎক্ষণাৎ ওই সৈন্যকে ডেকে এনে পরবর্তী অভিযানে তাকে অংশগ্রহণে নিষেধ করলেন। সুলতানের নির্দেশে ওই খ্রিস্টান আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জাঁহাপনা! সৈন্যটি তো কোনো অপরাধ করেনি; বেচারা আমাকে না পেয়ে আঙুর কর্তন করেছে ঠিকই; কিন্তু মূল্য বাবদ টাকা তো যথাস্থানে ঝুলিয়ে রেখে এসেছে!'

সুলতান গ্রাম্য খ্রিস্টানের উত্তরে বলেন, 'সেনাবাহিনীর সৈন্যদের নৈতিক অবস্থার ওপরই নির্ভর করে যুদ্ধের জয়-পরাজয়। সৈন্যটি যদি আঙুরের মূল্য বাবদ টাকা না ঝুলিয়ে রাখত, তাহলে পুরো উসমানি সেনাবাহিনী জালিম সাব্যস্ত হতো। এমতাবস্থায় আমি তার মস্তক কেটে ফেলতাম। কিন্তু সে যখন মূল্য রেখে এসেছে, তার প্রাণটা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। তবে মালিকের অনুমতি ছাড়া আঙুরের থোকা কেটে নিয়ে নৈতিকতার খেলাফ কাজ করায় আগামী যুদ্ধে তাকে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখলাম।'[৪৩]

---

৪৩. বাওয়াতিরু উসমানিয়্যাহ-৮৪, আবদুল করিম ইজ্জুদ্দিন।

Scanned by CamScanner

যে মসজিদ নির্মাণের আদেশদাতা রাসুল সা.

সুলতান সুলায়মান ঘুমিয়ে আছেন। স্বপ্নে দেখেন, প্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করছেন, 'একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করে নাও'! সে সাথে নবীজি সুসংবাদ দিচ্ছেন, 'মসজিদটি কেয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। সেখানে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হবে চিরকাল'!

সুলতান সুলায়মান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত সুসংবাদ আর অর্পিত দায়িত্ব নিয়ে জেগে উঠলেন ঘুম থেকে। তার অবয়ব জুড়ে আনন্দের উর্মিমালা ঢেউ খেলে চলছে। তৎক্ষণাৎ মসজিদ নির্মাণের কাজে লেগে যান। উজিরদের তলব করে ইস্তাম্বুলের সবচেয়ে উঁচু, দামি ও ভালো জায়গা খুঁজে বের করার আদেশ করলেন। কার্যত তারা তা-ই করল। সুলতানের বাতানো বর্ণনানুসারে একটি জায়গা চিহ্নিত করে সুলতানকে অবহিত করল। সুলতান খেলাফতের বড় মাপের ইঞ্জিনিয়ার আর মিস্ত্রিদের উপস্থিত করলেন। তাদের অন্যতম ছিলেন 'সিনান আগা'।

ইঞ্জিনিয়ার আর মিস্ত্রিদের সাথে নিয়ে সুলতান চিহ্নিত জায়গায় দাঁড়িয়ে স্বীয় দাড়িতে হাত বুলিয়ে এদিক ওদিক দেখছিলেন আর কী যেন ভাবছিলেন। কোনো কথা বলছিলেন না সুলতান। সকলেই তার আশপাশে ঠায় দাঁড়িয়ে। কিছুই বোঝে উঠতে পারছিলেন না তারা। শেষপর্যন্ত 'সিনান আগা' সুলতানের পাশ ঘেঁষে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, মুহতারাম! 'এখানে হবে মিম্বর, ওখানে মেহরাব। এখানে মাদরাসা, ওখানে দোকান-পাট। এখানে পাকঘর, ওখানে...।

বিস্মিত সুলতান সিনান আগাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কী করে জানলে–আমি এইসব বানানোর ইরাদা করছি'?

-জাঁহাপনা! যখন স্বপ্নযোগে সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে মসজিদ নির্মাণের সুসংবাদ দিয়ে আদেশ দিচ্ছিলেন, 'মসজিদটি কেয়ামত অবধি থাকবে'–তখন আমি আপনার পেছনে দাঁড়ানো ছিলাম। স্বপ্নে আমার কাছেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন এবং আপনাকে যে মসজিদ নির্মাণের আদেশ করেছিলেন, আমাকেও তা নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক! জানেন এটি কোন মসজিদ? এটিই হল ইস্তাম্বুলের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'সুলায়মানিয়া জামে মসজিদ'। যে মসজিদের জায়গায় অবস্থিত ছিল এক ইয়াহুদির কুঁড়েঘর।"[৪৪]

---

৪৪. তারিখুনা ওয়া হাজারাতুনাল ইসলামিয়্যাহ (ফেইসবুক পেইজ)।

Scanned by CamScanner

সুলতান সুলায়মানের ইনসাফ

উসমানি খেলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুলের 'সুলায়মানিয়া জামে মসজিদ' ও সংশ্লিষ্ট কলেজের নির্মাণকাজ সমাপ্ত। সুলতান সুলায়মান সকল মিস্ত্রি আর নির্মাণশ্রমিকদের একজায়গায় জড়ো করে একটা বক্তৃতা দিলেন। হামদ ও সানার পর সবাইকে লক্ষ করে বললেন,

'আমার মুসলিম ভায়েরা! এ মসজিদের নির্মাণকাজ আজ সমাপ্ত। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি ভুলক্রমে তার প্রাপ্য না নিয়ে থাকে, সে যেন এসে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়। আবার এরকম কেউ হয়ত এখানে উপস্থিত নাও থাকতে পারে। তোমরা যারা উপস্থিত আছো তারা অনুপস্থিতদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করিয়ে দিও। বলো, তারা যেন আমার কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য নিয়ে যায়।'

যেসব বালতি মসজিদ নির্মাণকাজে ব্যবহৃত হতো, সেগুলোকে পালাক্রমে কিছুক্ষণ বিরতি দেয়া হতো, যাতে বালতিগুলো আরাম করে নিতে পারে!

ইস্তাম্বুলের জনগণের মাঝে এ কথাটি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল যে, 'সুলায়মানিয়্যাহ জামে মসজিদ'র অধিকারী হলেন 'সুলায়মান', নির্মাতা হলেন 'সিনান' আর তার ইট হল 'ঈমান'!

এই অসম ন্যায়পরায়ণতায় মুগ্ধ হয়েই খ্রিস্টান নেতা 'মার্টিন লুথার' তার ঐতিহাসিক সেই মনোবাসনার বহিঃপ্রকাশ করেছিলেন এভাবে–
'হে প্রভু! শীঘ্রই আমাদের মাঝে তুর্কিদের মতো শাসক পাঠাও, যাতে আমরা তোমার ঐশী ন্যায়পরায়ণতার অংশ লাভ করতে পারি।'
তিনি আরও বলেছিলেন,
'যে তুর্কিরা সারা দুনিয়ায় ন্যায়পরায়ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেই তুর্কিদের বিরোধিতা করা হারাম!'[৪৫]

৪৫. খাওয়াতিরু উসমানিয়্যাহ-৮৭ আবদুল করিম ইজ্জুদ্দিন।

Scanned by CamScanner

সুলতানের পথরোধে বৃদ্ধা

অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ থেকে ইস্তাম্বুল ফিরছিলেন সুলতান সুলায়মান। উসমানি খেলাফতের বিশাল সেনাবহর তাঁর সাথে। পথিমধ্যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে গতিরোধ করে দাঁড়াল বয়সের ভারে ন্যুব্জ এক বুড়ি। বুড়ি লাগাম ধরাবস্থায়ই বলল, আপনার কাছে আমার একটা অভিযোগ।

-কার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ বুড়িমা?

-আপনার বিরুদ্ধে!

-কেন বুড়িমা কী ক্ষতি করেছি আমি?

-আপনার সেনাবহর আমার ক্ষেত নষ্ট করে দিয়েছে!

এবার সুলতানের কপালে সত্যিই চিন্তার ভাঁজ পড়ে গেল। কতক্ষণ মস্তক অবনমিত করে রইলেন। একসময় অশ্রুসজল চোখে মাথা উত্তোলন করে বৃদ্ধাকে প্রবোধ দিতে লাগলেন। শোনাতে থাকলেন সান্ত্বনার বাণী। সুলতানের জল ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধা সব ভুলে গেল। সন্তুষ্ট হয়ে সুলতানকে ক্ষমা করে দিল। সুলতান কাফেলাকে সামনে অগ্রসর হওয়ার আদেশ করলেন...।

রাতের আঁধারে ইস্তাম্বুলের এক মহিলার ঘরে চুরি হয়েছিল। মহিলা ঘুম থেকে জেগে দেখতে পায় পুরো ঘর উজাড়! অভিযোগ দায়ের করতে দৌড়ে রাজদরবারে আসল মহিলা। এসে দেখল সুলতানের দরবার চলছে। জনাকীর্ণ দরবার। সুলতান বাদী-বিবাদীর অভিযোগ শুনছেন আর বিচার করছেন। মহিলা লোকে লোকারণ্য এই দরবারে তার ঘর চুরি হওয়ার অভিযোগ করল! শুনে তো সুলতান রেগে আগুন! তিনি রাগে কটমট করে বললেন, 'কিসের এতো গভীর ঘুম যে, নিজের ঘর চুরি হয়ে যায় অনুভবই করতে পারো না?'
মহিলা জবাব দেয়, 'জাঁহাপনা! আমরা তো জানতাম, আপনি জাগ্রত থেকে আমাদের দেখাশোনা করছেন। তাই নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম।'

এবার সুলতানের রাগ মোমের মতো গলে গেল। তিনি কতক্ষণ নিচের দিকে মাথা নুইয়ে রইলেন। খানিক পর মাথা উঠিয়ে জড়ানো কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ!'

এরপর সুলতান ক্ষতিপূরণবাবদ মহিলার চুরি হওয়া সম্পদের পরিমাণ সম্পদ আদায় করার ফরমান জারি করলেন।[৪৬]

---

৪৬. খাওয়াতিরু উসমানিয়্যাহ-৬৯, আবদুল করিম ইজ্জুদ্দিন।

Scanned by CamScanner

ফ্রান্সকে নৃত্যগান বন্ধের হুশিয়ারি

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে সুলতান সুলায়মানের শাসনামলে ফ্রান্সে হঠাৎ করেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যুবক-যুবতীরা একসাথে নাচগান করার সংস্কৃতি চালু করে। এ খবর সুলতান সুলায়মানের কর্ণগোচর হলে তিনি তৎক্ষণাৎ ফ্রান্স সরকারকে চিঠি লিখলেন–

"শুনেছি আপনাদের দেশে যুবক-যুবতীরা এমনভাবে ঢলাঢলি করে অনুষ্ঠানে নাচগান করে, যা নীতি-নৈতিকতা, শরম-লজ্জা এবং চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক। আর তা হয় আপনাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায়। যেহেতু আপনারা আমাদের প্রতিবেশী তাই ওইসব অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা আমাদের দেশে আমদানি হবার আশঙ্কা প্রবল। অতএব, আপনাদের কাছে আমার এই পত্রটি পৌঁছার সাথে সাথে এসব অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বন্ধ করে নিতে হবে। অন্যথায় আমি নিজেই তা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে যাব।"

অস্ট্রিয়ান ঐতিহাসিক হ্যামার লিখেন, 'উক্ত পত্রপ্রাপ্তির পর থেকে ফ্রান্সে একশ বছর পর্যন্ত প্রকাশ্যে নাচগান বন্ধ ছিল। হলেও চুপিসারে গোপনে হতো!'

উল্লেখ্য, উসমানি খেলাফত বিলুপ্ত করার পর ১৯৩২ সালে ক্রুসেডার ফ্রান্স তাদের এজেন্ট মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে আঙ্কারায় বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতায় 'করিমন খালিস' নামের এক তুর্কি যুবতী বিশ্বসুন্দরী সাব্যস্ত হয়। সে শুধুমাত্র ব্রা আর পেন্টি পরে পুরো মঞ্চ কাঁপিয়ে নেচেছিল।

অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগিতার নির্বাচন কমিটির প্রধান জনৈক ফ্রান্স কর্মকর্তা অত্যন্ত দম্ভ ভরে বলেছিল, 'আজ হল ইউরোপের বিজয়ের দিন। চৌদ্দশ বছর পৃথিবীকে শাসনকারী ইসলামের উপর আজ ইউরোপ বিজয় লাভ করল। একসময় সুলতান সুলায়মান ফ্রান্সে নাচগানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন শুধুমাত্র এই ভয়ে যে, তার সাম্রাজ্যেও এই সংস্কৃতি আমদানি হয়ে যেতে পারে! কারণ, উসমানি সাম্রাজ্যের সীমানা তখন ফ্রান্স পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু আজ এই 'করিমন খালিস' একজন মুসলিমা যুবতী হয়েও আমাদের সামনে শুধু একটি ব্রা আর পেন্টি পরে নৃত্য করল! অতএব বলতে পারি আজকের দিন অবশ্যই ইউরোপের বিজয়ের দিন। ইউরোপবাসীর খুশির দিন!'[৪৭]

---

৪৭. খাওয়াতিরু উসমানিয়্যাহ, আবদুল করিম ইজ্জুদ্দিন। *তুর্কিয়া আল উসমানিয়্যাহ (ফেইসবুক পেইজ)।

Scanned by CamScanner

পোশাক দেখেই স্প্যানিশ সেনাদলের পলায়ন

হল্যান্ডের রাজা 'স্যার থমাস মোর' বা 'ছোট হ্যান্স হলব্যান' (মৃত্যু-১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ) শুনতে পেলেন, হল্যান্ডের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে স্পেন সম্রাট তার বিশাল সেনাবাহিনীকে হল্যান্ড অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দিয়েছে। খবরটা হল্যান্ড রাজাকে হতবিহবল করে দেয়। আচমকা এ হামলার মোকাবেলা করার সামর্থ না থাকায় হল্যান্ড রাজা উসমানি খেলাফতের ভূমিতে অবস্থানরত তাদের রাষ্ট্রদূতের কাছে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিতে তিনি সুলতান সুলায়মানের কাছে চল্লিশজন উসমানি সেনা পাঠানোর সাহায্য কামনা করলেন।

চিঠিটা পেয়েই দূত অতি দ্রুত ইস্তাম্বুল অভিমুখে রওয়ানা হল। মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড় পেরিয়ে অবশেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে সে এসে পৌঁছাল তোপকাপি রাজমহলে। রাজমহলে পৌঁছেই সে মহাপ্রতাপধর সম্রাট, খলিফাতুল মুসলিমিন সুলতান সুলায়মানের স্বাক্ষাৎ চাইল। সুলতান তখন তোপকাপি রাজমহলের বাইরের বাগানে বসে তার পুত্রসন্তান মুস্তফাকে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। রাষ্ট্রদূত তৎক্ষণাৎ বাগানের দিকে পা বাড়াল। বাগানে এসে চিঠিটা সে সুলতানের উজিরে আজম ইবরাহিম পাশার হাতে দিল।

সুলতান সুলায়মান উজিরে আজমকে চিঠি পড়তে আদেশ করলেন। উজিরে আজম পড়তে লাগলেন–

> "হল্যান্ড সম্রাটের পক্ষ থেকে উসমানি সুলতানের প্রতি!
> আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আপনার বিশেষ বাহিনী থেকে মাত্র চল্লিশজন সেনা প্রদান করেন, তাহলে আমি আপনাকে বার্ষিক ১৬ হাজার লিরা (তখনকার মুদ্রা) কর প্রদান করব। আপনি কি তা চান না?"

উজিরে আজম ইবরাহিম পাশা চিঠি পড়া শেষ করে নিজে থেকে এই পরামর্শ দিলেন, 'জাঁহাপনা! উসমানি সেনাবাহিনী থেকে বাছাই করে চল্লিশজন 'জেনোসারি' সৈন্য পাঠিয়ে দিন, তাহলে বার্ষিক ১৬ হাজার লিরা কর হিসেবে পাবেন; যা উসমানি কোষাগারে অনেক কল্যাণ বয়ে আনবে।'

উজিরে আজমের পরামর্শ শুনে সুলতান সুলায়মান বললেন, 'আমাকে কিছু সময় দাও। চিন্তা করে দেখি কী করা যায়। আগামীকাল আমি পত্রের জবাব দেব। সে পর্যন্ত আমাকে ভাবতে দাও।'

Scanned by CamScanner

সুলতানের কথা শুনে হল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত সেখান থেকে চলে যায়। সুলতানের নির্দেশে রাজদূতকে রাজকীয়ভাবে আদর-আপ্যায়ন করানো হয়। পরদিন সকাল হলে দূত সুলতানের কাছে এসে হাজির। সুলতান তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন একখানা চিঠি। দূত চিঠি খুলে পড়তে শুরু করল। চিঠি পড়া শেষ হলে রাষ্ট্রদূত একেবারে চুপ মেরে বসে রইল! তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরুচ্ছিলো না। সে বড় বড় চোখে কেবল সুলতানের দিকে তাকাচ্ছিল।

সুলতান তার আশ্চর্যের পরিধি অনুভব করতে পেরে বললেন, 'এখানে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যাও, তোমার সম্রাটকে গিয়ে বলবে, তিনি যেন চিঠিতে উল্লিখিত পন্থা অনুসরণ করেন। এরপরই না ফলাফল দেখতে পারবেন।'

চিঠিতে লেখা ছিল–"তিন মহাদেশের শাসক মহান সুলায়মানের পক্ষ থেকে হল্যান্ড সম্রাটের প্রতি!

আপনাকে আমার বিশেষ চল্লিশজন 'জেনোসারি' সৈন্য প্রেরণ করব না; বরং আমি আমার চল্লিশজন জেনোসারি সৈন্যের যুদ্ধের পোশাক প্রেরণ করব। এসব পোশাক আপনি আপনার চল্লিশজন সৈন্যকে পরিয়ে নিবেন। দেখবেন স্পেনিশরা কীভাবে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করে!"

তাই করেছিলেন হল্যান্ডের সম্রাট। আক্রান্ত হবার আগেই তিনি তার বিশেষ চল্লিশজন সৈন্যকে উসমানি বাহিনীর জেনোসারি সৈন্যের যুদ্ধের পোশাক পরিয়ে নেন। অতঃপর এই চল্লিশজনকে সম্মুখের কাতারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখেন। স্পেনিশরা হল্যান্ড সৈন্যদের সামনের কাতারে উসমানি জেনোসারি সৈন্য দেখে একেবারে ভড়কে যায়। হল্যান্ড বিজয় করার জন্য যে মনোবল নিয়ে তারা এসেছিল, তা মুহূর্তেই উবে যায়! কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ মাঠ ছেড়ে স্পেনের পথে পলায়ন করে ওই কাপুরুষরা!

স্পেনিশ সৈন্যরা পলায়ন করে তাদের দেশে পৌঁছে যাওয়ার পর হল্যান্ড সম্রাট একটি সিন্ধুকের ভেতর তিন বছরের বার্ষিক করসহ চল্লিশটা যুদ্ধের পোশাক ফেরত পাঠালেন সুলতান সুলায়মান কানুনির দরবারে।[৪৮]

৪৮. আল জাজিরা ডটনেট (আরবি ১৭/৩/২০১৭) *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ (ফেইসবুক পেইজ)।

Scanned by CamScanner

বাক্সভর্তি ফাতওয়া নিয়ে কবরে

তোপকাপি রাজপ্রাসাদের কর্মকর্তাগণ সুলতান সুলায়মানকে অবহিত করলেন, প্রাসাদ সংলগ্ন গাছের ডালে ডালে পিঁপড়ার আনাগোনা ব্যাপকহারে বেড়ে গেছে। দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নেয়া না হলে রাজপ্রাসাদ আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে। তখন প্রাসাদে বসবাস মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। সুলতানের কাছেও খবরটা খুবই বিপজ্জনক ঠেকছিল।

সুলতান মন্ত্রীপরিষদের জরুরি সভা ডাকলেন। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, গাছের ডালে ডালে চুনকাম করিয়ে দিতে হবে। এতে করে পিঁপড়েগুলো মারা পড়বে। পিঁপড়ের উপদ্রব থেকে রেহাই পাবে রাজপ্রাসাদের লোকজন। কিন্তু এতগুলো পিঁপড়েকে বধ করতে তিনি মন থেকে সায় পাচ্ছিলেন না। অবশেষে দ্বারস্থ হলেন খেলাফতের প্রধান মুফতি শায়খুল ইসলামের। খেলাফতের সাধারণ বিষয়েও তিনি শায়খুল ইসলামের ফাতওয়ানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। শায়খুল ইসলামের ফাতওয়া ছাড়া একচুলও নড়াচড়া করেন না।

তখন খেলাফতের প্রধান মুফতিকে 'শায়খুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত করা হতো। এটি ছিল সুলতান ও উজিরে আজম পদের পরবর্তী খেলাফতের তৃতীয় বড় পদ। উসমানি খেলাফতের সবচেয়ে বড় আলেম ও বিজ্ঞ মুফতিই এই পদের যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন।

সুলতান সুলায়মান শায়খুল ইসলাম 'আল্লামা আবুস সাউদ আফেন্দি'-কে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করতে এসে তাকে না পেয়ে একটি চিঠি লিখলেন। উল্লেখ্য, সুলতান ছিলেন নামকরা একজন কবি। কাব্যাকারেই লিখলেন–

"গাছের ডালে পিঁপড়ে যখন করবে বিচরণ,
বধ করলে সেগুলোকে পাপ হবে কি কন?"

শায়খুল ইসলাম আল্লামা আবুস সাউদ আফেন্দিও ছিলেন একজন শক্তিমান কবি। চিঠি পড়ে তিনিও কাব্যাকারে ফাতওয়া লিখলেন–

"ন্যায়ের নিক্তি করা হবে যখন সম্প্রসারণ,
পিঁপড়ে তার প্রাপ্য নিয়েই ক্ষান্ত হবে তখন।"

প্রধান মুফতি বোঝাতে চাইলেন, পিঁপড়ে বধ করা শরিয়তসম্মত নয়।

Scanned by CamScanner

সুলতান সুলায়মান 'জেকতুর যুদ্ধে' রওয়ানা হলে পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন। লোকজন তার লাশ ইস্তাম্বুল নিয়ে আসে। খেলাফতের লোক আর উলামায়ে কেরাম তাকে দাফন করার জন্য প্রস্তুত হলে তারা একটি চিরকুট দেখতে পান। চিরকুটে সুলতান সুলায়মান একটি বাক্স তার কফিনের ভেতর ভরে কবরস্থ করার ওসিয়ত করে গেছেন। তারা মনে করলেন, নিশ্চয় বাক্সটিতে প্রচুর ধন-সম্পদ বিদ্যমান থাকবে। তাই বাক্সটি মাটির নিচে পুঁতে ফেলে বিনষ্ট করতে চাইলেন না। তারা বাক্সটি খুলে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সকলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাক্স খোলা হল। বাক্সের মুখ খুলতেই সবাই হতবাক হয়ে পড়লেন! এ-কী, বাক্সটি কাগজে ভরপুর! সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ়! বাক্সটির মধ্যে এতো কাগজ কেন? কেনোইবা কাগজভর্তি বাক্সটাকে নিজের কবরে রাখার অসিয়ত করে গেলেন সুলতান!

খেলাফতের লোকজন কাগজগুলো হাতে নিয়ে দেখতে পেলেন, এসব হল ফাতওয়ার কাগজ! শায়খুল ইসলামের প্রদত্ত বিভিন্ন বিষয়ের ফাতওয়া! সুলতান সুলায়মান তার খেলাফতকালে শায়খুল ইসলাম আর উলামায়ে কেরামদের কাছ থেকে যতো ফাতওয়া সংগ্রহ করেছিলেন, সব ফাতওয়াই এ বাক্সে বিদ্যমান। সুলতান এই ফাতওয়াগুলো তার কবরে রাখার অসিয়ত করে গেছেন–যাতে হিসেব-নিকেশের দিন তিনি নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারেন!

সকলের সাথে সেখানে উপস্থিত ছিলেন খেলাফতের প্রধান মুফতি শায়খুল ইসলাম আল্লামা আবুস সাউদ আফেন্দি। বিষয়টি বুঝতে পেরে শায়খুল ইসলাম আল্লামা আবুস সাউদ আফেন্দি হু হু করে কেঁদে উঠলেন। কান্নাবিজড়িত গলায় বলতে লাগলেন,

> 'হে খলিফা সুলায়মান কানুনি! আপনি তো নিজেকে বাঁচিয়ে নিলেন! যদি আমরা আমাদের প্রদত্ত ফাতওয়ায় ভুল করে থাকি, তাহলে আমাদেরকে কোন আসমান ছায়া দিবে, আর কোন জমিনই বা আমাদেরকে বহন করবে?'[৪৯]

৪৯. আদ দুরারুল বাহিয়্যাহ মিন সিরাতিদ দাওলাতিল আলিয়্যাতিল উসমানিয়্যাহ-২৬২, ড. ইবরাহিম হাসান আবু জাবির।

Scanned by CamScanner

শাহজাদি মিহরিমাহ সুলতান

শাহজাদি মিহরিমাহ সুলতান ছিলেন সুলতান সুলায়মানের একমাত্র কন্যা। সুলতানের রূপসী স্ত্রী সম্রাজ্ঞী খুররামের মেয়ে। 'মিহরিমাহ সুলতানা' মায়ের মতোই চোখ ধাঁধানো রূপ-লাবণ্য নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন। তিনি ছিলেন অতুলনীয় সুন্দরী। 'মিহরিমাহ' নামটি দুটি ফারসি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। ফারসিতে 'মিহর' অর্থ সূর্য আর 'মাহ' অর্থ চাঁদ। তার সৌন্দর্যের কারণে তাকে এই নাম দেয়া হয়েছিল।

উসমানি খেলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুল তৎকালীন ইউরোপ ও এশিয়া দুই ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল। ইস্তাম্বুলের এক অংশ ছিল ইউরোপীয় সীমানায় আর অপর অংশ ছিল এশীয় সীমানায়। শাহজাদি মিহরিমাহ জামে মসজিদ নির্মিত ছিল ইস্তাম্বুলের এশিয়ান অংশে 'উসকুদার' নামক এলাকায়। এই মসজিদ হল তুরস্কে উসমানিদের স্থাপত্য নিদর্শনের এক অন্যতম নিদর্শন।

মসজিদটি শুরুতে উসমানি একাডেমিক আদলে ছিল। মসজিদের বিশাল সীমানায় ছিল বড় একটি রান্নাঘর, হাসপাতাল ও বিদ্যালয়। মসজিদটি নির্মাণ করেন সে যুগের প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার 'সিনান পাশা'। মসজিদটি নির্মাণের পেছনে লুকিয়ে আছে একটি চমকপ্রদ কাহিনী।

শাহজাদি মিহরিমাহ সুলতানার সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন 'দিয়ারে বকর' প্রদেশের গভর্নর আহমদ পাশা। তেমনিভাবে মুগ্ধ ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার সিনান পাশাও। উভয়েই ছিলেন শাহজাদি মিহরিমাহ সুলতানার প্রেমে দিওয়ানাপ্রায়। মিহরিমাহ সুলতানা ছিলেন এই দুই পাশার হৃদয়ের রাজরাণি। তবে ব্যাপারটা কেউ জানতো না। কিন্তু ভাগ্যের লিখন খণ্ডায় কে?

শেষ পর্যন্ত জিতে গেলেন আহমদ পাশা। তিনি বিয়ে করে নিলেন শাহজাদি মিহরিমাহ সুলতানাকে। বিরহের অঙ্গারে জ্বলেপুড়ে ছাই হতে থাকল সিনান পাশার অন্তর। কিন্তু তিনি তা বাইরে প্রকাশ করলেন না; চাপা দিয়ে রাখলেন হৃদয়ের গহীনে।

Scanned by CamScanner

বিয়ের পর শাহজাদি মিহরিমাহ সুলতানা সিনান পাশাকে তার নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করার আদেশ করলেন। ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে সিনান পাশা শাহজাদি মিহরিমাহ সুলতানার নামে ইস্তাম্বুলের এশিয়ান অংশে উসকুদার এলাকায় নির্মাণ করে দেন একটি নয়নাভিরাম মসজিদ।

পরবর্তীতে ১৫৬২-১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে তার নামে ইস্তাম্বুলের ইউরোপীয় অংশে 'এডির্নকাপি' এলাকায় আরও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

শাহজাদি মিহরিমাহ সুলতানের নামে দুই দুটি মসজিদ নির্মাণের গোপন রহস্য হল, প্রতি বছর ২১ মার্চ শাহজাদির জন্মদিনে ইউরোপীয় অংশে শাহজাদির নামে নির্মিত মসজিদের মিনারের পেছনে যখন সূর্য ডুবে যায়, তখন এশীয় অংশে তারই নামে নির্মিত মসজিদের মিনারের পেছনে চন্দ্র উদিত হয়!

চন্দ্র আর সূর্য যেভাবে একে অপরের নাগাল পায় না; ঠিক তেমনি ইঞ্জিনিয়ার সিনান পাশাও তার মনের মণিকোঠায় লালিত প্রিয়তমার নাগাল পাননি। এজন্যই তিনি ইস্তাম্বুলের ইউরোপিয়ান ও এশিয়ান অংশে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে প্রিয়তমার নামে দুই-দুইটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন।[৫০]

৫০. তুর্কপ্রেস ডটকম।

দুই আলেমের মনোভাব

'শায়খ আজিজ মাহমুদ হাদাই' ছিলেন সুলতান প্রথম আহমদের (১৬০৩-১৬১৭) একজন প্রিয় আলেম। মুহাব্বতের দৃষ্টান্ত হিসেবে একবার তিনি শায়খ আজিজ মাহমুদ হাদাইর কাছে কিছু হাদিয়া পাঠালেন। কিন্তু শায়খ তা ফিরিয়ে দিলেন। কারণ, হাদিয়াটা এসেছে দুনিয়ার একজন বাদশাহর দরবার থেকে। পরে তিনি এই হাদিয়াটা প্রেরণ করলেন শায়খ আবদুল মজিদ আসসিওয়াসির দরবারে। শায়খ আবদুল মজিদ আসসিওয়াসি তা কবুল করে নিলেন।

পরবর্তীতে হাদিয়া গ্রহণ উপলক্ষে সুলতান প্রথম আহমদ শায়খ আবদুল মজিদ আসসিওয়াসির দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন,

> 'শায়খ! এই হাদিয়াটা আপনার পূর্বে আমি শায়খ আজিজ মাহমুদ হাদাইর দরবারে পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু তিনি এটা গ্রহণ করেননি; ফিরিয়ে দিয়েছেন! কিন্তু আপনার কাছে এটা পাঠালাম, আর আপনি এটা কবুল করে নিলেন!'

শায়খ আবদুল মজিদ আসসিওয়াসি জবাবে বললেন,

> 'মহামান্য সুলতান! শায়খ আজিজ মাহমুদ হাদাই হলেন 'আনকা' (দুর্লভ প্রজাতির পাখি) পাখির মতো। আর আনকা পাখি মরদেহে বসে না!'

সুলতান প্রথম আহমদ এই জবাব শুনে খুব খুশি হলেন।

কিছুদিন পর সুলতান শায়খ আজিজ মাহমুদ হাদাইর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার দরবারে উপস্থিত হন। দরবারে উপস্থিত হয়ে সুলতান শায়খকে লক্ষ করে বলেন,

> 'শায়খ! আমি আপনাকে হাদিয়া প্রেরণ করেছিলাম, আপনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু একই হাদিয়া আমি শায়খ আবদুল মজিদ আসসিওয়াসিকেও পাঠালে তিনি তা কবুল করে নেন?'

শায়খ আজিজ মাহমুদ হাদাই ঈষৎ মুচকি হেসে জবাব দেন,

> 'জাঁহাপনা! শায়খ আবদুল মজিদ আসসিওয়াসি হলেন বিশাল সাগরের মতো। আর সাগরের মধ্যে একফোঁটা নাপাক পড়লে তা সাগরকে কলুষিত করতে পারে না!'

আহ! কী সুন্দর মনোভাব![৫১]

---

৫১. খাওয়াতিরু উসমানিয়্যাহ-১২৪, আবদুল করিম ইজ্জুদ্দিন।

Scanned by CamScanner

আদালতের বিচারক স্বয়ং রাসুল সা.

সুলতান প্রথম আহমদ বিখ্যাত 'নীল মসজিদ' নির্মাণ করার ইচ্ছা করলে খেলাফতের জনৈক উপদেষ্টা সংবাদ দেন, মিশরের 'সুলতান কাইতবাই'র মসজিদে রয়েছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'পা মোবারক'-এর একটি চিহ্ন। কথাটা শুনে সুলতান তার নির্মিতব্য মসজিদে 'পা মোবারক'-এর চিহ্নটি রাখার জন্য মিশরের 'সুলতান কাইতবাই'-কে ওই চিহ্নটি পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ দেন। সুলতানের আদেশটি মাথা পেতে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না সুলতান কাইতবাইর। কারণ, আদেশদাতা ছিলেন উসমানি সুলতান। গোটা বিশ্বের 'খলিফাতুল মুসলিমিন'। মনটা ব্যথায় টনটন করলেও 'পা মোবারক'র চিহ্নটি তিনি পাঠিয়ে দিলেন সুলতানের দরবারে।

মোবারক ওই চিহ্নটি দরবারে পৌঁছার পরই একরাতে সুলতান স্বপ্নে দেখেন, দুনিয়ার সব সম্রাটরা একটি আদালতে উপস্থিত। সবার সাথে সেখানে উপস্থিত তিনি এবং মিশরের সুলতান কাইতবাইও। আদালতের বিচারপতি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ইত্যবসরে সুলতান কাইতবাই আদালতের বিচারপতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আসনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বাদী হয়ে মামলা ঠুকে দিলেন সুলতান আহমদের বিরুদ্ধে। মামলার জবানবন্দিতে তিনি বলছিলেন, তিনি পা মোবারকের এই চিহ্নটা চার লাখ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়ে খরিদ করেছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোনো এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে। খরিদ করেছিলেন নিজের মসজিদে রাখার জন্য। যাতে মানুষ সর্বদা তার জন্য কল্যাণের দোয়া করে।

বাদীর জবানবন্দি শুনে বিচারপতি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফয়সালা দিয়ে দেন সুলতান কাতবাইর পক্ষে। এদিকে ঘুম ভাঙতেই পেরেশান হয়ে উঠেন সুলতান। খেলাফতের আলেমদের ডেকে তাদের সামনে স্বপ্ন বর্ণনা করে ব্যাখ্যা জানতে চান তিনি। সব শুনে উলামায়ে কেরামগণ বলেন, মহামান্য সুলতান! স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো একেবারে স্পষ্ট। আপনি 'পা মোবারক'র চিহ্নটি 'সুলতান কাইতবাই'-কে ফিরিয়ে দিন।

এরপর সুলতানের নির্দেশে যথাস্থানে ফিরিয়ে দেয়া হয় ওই মোবারক চিহ্ন। মিশরীয় সুলতান কাইতবাই আবারও ফিরে পান তার প্রিয়তম স্মৃতিচিহ্ন।[৫২]

৫২. আসদিকাউদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ (ফেইসবুক পেইজ)।

Scanned by CamScanner

বাবুর্চি হাসান জওলাকের আত্মদান

হাসান জওলাক। একজন উসমানি সাহসী নওজোয়ান। তার খুবই আগ্রহ-সে হবে উসমানি সেনাদলের 'জেনোসারি' দলের একজন সদস্য। যুদ্ধের ময়দানে সাহসিকতা আর বীরত্বের নৈপুণ্য প্রদর্শন করবে। কিন্তু তার আশার বিপরীতে নিয়োগ দেয়া হয় তোপকাপি রাজপ্রাসাদের একজন সহকারী বাবুর্চি পদে।

১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ। সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদ (১৫৯৬-১৬০৩) তখন উসমানি খেলাফতের খলিফা। মুসলিম বিশ্বের অভিভাবক। ইউরোপীয় বহুজাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে হাজুভা যুদ্ধের জন্য তখন খেলাফত প্রস্তুতি শুরু করেছে। সেনাবাহিনী রণসাজে সজ্জিত। যে কোনো সময় বেজে উঠতে পারে যুদ্ধের নাকারা। যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন স্বয়ং সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদ।

হাসান জওলাক খুশি। নিশ্চয় উসমানি বাহিনীর বাবুর্চি হয়ে রণক্ষেত্রে যাবার সুযোগে হবে তার। যুদ্ধে শরিক হয়ে বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনও করতে পারবে হয়ত। কিন্তু না, তাকে সেনাবাহিনীর বাবুর্চি হিসেবে এলাও করা হলো না: সাময়িক বরখাস্ত করা হল। কারণ, তার ঘাড়ে দেখা দিয়েছিল হাল্কা ব্যাধি। খবরটা শোনার পর সম্ভব সব চেষ্টা-তদবির করে গেল জাওলাক। কিন্তু যখন সব চেষ্টা ভেস্তে গেলে, ভগ্ন মনোরথে জাওলাক আপন ঘরে এসে হু হু করে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

খাজা সাইদুদ্দিন ছিলেন তখনকার একজন প্রসিদ্ধ আলেম। তিনি ছিলেন সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদের একজন উপদেষ্টা। তিনি বাগানে হাঁটছিলেন। সহসা একটা কান্নার আওয়াজ তার কর্ণকুহরে এসে পৌছলে তিনি কান খাড়া করে অনুভব করতে চাইলেন, কোন দিক থেকে আসছে কান্নার শব্দটা। কিছুক্ষণ কান পেতে থাকার পর বুঝতে পারলেন, আওয়াজটা আসছে বাগানের সাথে লাগোয়া বাবুর্চিদের রুমের দিক থেকে। অন্তর বিদীর্ণকারী সে কান্নার আওয়াজ আকুল করে তুলেছিল খাজার পুরো সত্তা। তিনি ধীরে ধীরে রুমগুলোর দিকে আওয়াজের আগমন দিক লক্ষ করে এগিয়ে যেতে লাগলেন। দরজায় করাঘাত করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, দরজা খোলাই ছিল। সরাসরি রুমে ঢুকে পড়লেন। ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন, বাপু কী হয়েছে? এমন করে কাঁদছ কেন?

-কিছু না, এমনিতেই! কথাটা বলে অশ্রু মুছতে লাগল হাসান জওলাক।

-বৎস! আমার কাছে লুকাতে যেয়ো না, খুলে বলো। সম্ভবত আমি তোমার কোনো সাহায্য করতে পারব।

Scanned by CamScanner

-আজ থেকে আমি আর 'জেনোসারি' সৈন্য হতে পারব না! আর কখনও সেনাবাহিনীর রান্না করতে পারব না! একইভাবে সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ-জিহাদের ময়দানে শরিক হতে পারব না-কথাগুলো বলেই হাসান জওলাক আগের চেয়ে আরও বেশি কান্নায় ভেঙে পড়ল।

হাসান জওলাকের কথা শুনে খাজা সাইদুদ্দিন যেমন মর্মাহত হলেন তেমনি তার জিহাদ ও খিদমতের অদম্য স্পৃহা দেখে পুলকিতও হলেন। তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন-

'বৎস! অচিরেই তুমি যুদ্ধে শরিক হবে। তুমি তো জানো, যুদ্ধে শুধু যোদ্ধারাই লড়ে না; সেখানে অনেক কর্মচারী-বাবুর্চিরাও লড়ে। সকলে মিলেই হয় একটি সেনাদল। সকলের হাত মিলেই হয় একটি হাত। তবে সেখানে অনুপযুক্ত কাউকে সুযোগ দেয়া হয় না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে খাজা সাইদুদ্দিন বললেন, 'ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমি যাব। আমি সুলতানের কাছে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব।'

জওলাকের মনের নিভে যাওয়া আশার সলতায় পুনরায় আগুন জ্বলে উঠল। আবেগের আতিশয্যে খাজার হাতে চুমো খেতে লাগল হাসান।

খাজা সাইদুদ্দিন সুলতান সমীপে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলেন। পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। সুলতান অনুভব করতে পারলেন-হাসান জওলাকের জিহাদের তামান্না ও খিদমতের আকাঙ্ক্ষা। তদুপরি খাজা সাইদুদ্দিনের মতো লোকের সুপারিশ তো আর ফেলে দেয়া যায় না। সুলতান হাসান জওলাককে সেনাবাহিনীর বাবুর্চি হয়ে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

১৫৯৬ সালের ২২ অক্টোবর উসমানি খেলাফত আর ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের মধ্যকার 'হাজুভা'র ময়দানে শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়ী ঐতিহাসিক লড়াই। এটি ছিল 'হাজুভা'র প্রাথমিক যুদ্ধ। যুদ্ধে উসমানি বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদ। হাসান জওলাকও উসমানি বাহিনীর সেবায় নিয়োজিত আছে। মনের সুখে বাহিনীকে রান্না করে খাওয়াচ্ছে। নিজের বীরত্বের সাক্ষর রাখার জন্য মোক্ষম কোনো সুযোগের অপেক্ষা করে চলছে। তিনদিন ধরে চলছে প্রচণ্ড লড়াই। ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা উসমানি বাহিনীর ওপর চড়াও হয়ে বসেছে। কোনোভাবেই উসমানি সৈন্যরা ময়দানে পা জমাতে পারছে না। দেখতে দেখতে এগারশ উসমানি সৈন্য শাহাদত বরণ করে নিল। বিয়াল্লিশটি কামান ভেঙে পড়ল। একপর্যায়ে ক্রুসেডাররা উসমানি সেনা

Scanned by CamScanner

কোষাগার লুট করে সেখানে উড্ডীন করে ফেলল ক্রুশের পতাকা। সেখানে নাচগান করতে আরম্ভ করল উন্মত্ত ক্রুসেডাররা!

হাসান জওলাক হাতের কাজ সেরে বাবুর্চিখানার তাবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করত। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ দেখে সে নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারত না। যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইত। কিন্তু অনুমতি ছাড়া তো আর ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না।

আরও চারদিন পর ২৬ অক্টোবর শুরু হল হাজুভার ফাইনাল যুদ্ধ। ক্রুসেডারদের মধ্য থেকে জার্মানরা সর্বপ্রথম হামলে পড়ল উসমানিদের উপর। উসমানি সেনাবাহিনীর তুলনায় ইউরোপীয়দের সৈন্যসংখ্যা ও শক্তিমত্তা বেশি। সময় যত গড়াচ্ছিল, ইউরোপীয় বাহিনীর হামলার ভয়াবহতা বাড়ছিল। উসমানিরা পিছু হটতে শুরু করেছিল। একপর্যায়ে তারা সুলতানের তাবুর কাছে এসে পৌঁছে গেল! সুলতানের তাবু এখন ইউরোপীয়দের হামলার আওতায়!

সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদ শাহি ঘোড়া থেকে নেমে তার খাস তাবুর মধ্যে প্রবেশ করলেন। সুলতানের গায়ে ছিল রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহৃত চাদর। হাতে ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহৃত বর্শা। খিমায় ঢুকে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে লাগলেন সুলতান।

ইত্যবসরে সুলতানের তাবুতে এসে প্রবেশ করলেন উজিরে আজম ইবরাহিম পাশা। এসেই তিনি দোয়া থামিয়ে দিয়ে সুলতানকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন,

'জাঁহাপনা! আপনাকে এখনই পলায়ন করতে হবে। পলায়ন করাটা একেবারে জরুরি হয়ে পড়েছে। শত্রুরা সুলতানি তাবুর একেবারে নিকটে এসে গেছে। শত্রুদের হাতে আপনি বন্দি হয়ে যাবেন। আপনি বন্দি হয়ে গেলে অনেক লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে। উসমানি খেলাফতও ধ্বংস হয়ে যাবে।'

উজিরে আজমের কথায় পলায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন সুলতান। কিন্তু যেইমাত্র তিনি শাহি ঘোড়ায় আরোহণ করলেন, অমনি কোত্থেকে দৌড়ে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেললেন তার উস্তাদ শায়খ খাজা সাইদুদ্দিন আফেন্দি! খাজা সুলতানের ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন,

'যুদ্ধের ময়দান থেকে যে সুলতান পলায়ন করেন, তার সেনাদল মনোবল হারিয়ে ফেলে! তারা বিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে! যুদ্ধ চলবে, এখানে কোনো

Scanned by CamScanner

পরাজয় নেই। নিশ্চয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।'

এরপর খাজা সাইদুদ্দিন সুলতানের ঘোড়ার লাগাম ধরে টেনে উসমানি সৈনাদের মাঝে নিয়ে গেলেন। সৈন্যরা তাদের মাঝে সুলতানকে দেখতে পেয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। তাদের মনোবল আরও চাঙা হয়ে উঠল। তখন তাদের তীব্র পাল্টা আক্রমণের মুখে ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা পিছু হঠতে বাধ্য হল।

পরদিন ২৭ অক্টোবর। আবারও শুরু হল উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই। এবারও ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের পাল্লা ভারি। উসমানিরা ময়দানে টিকতে পারছে না কিছুতেই। শুধুই পিছু হটছে। অস্ট্রিয়ান বাহিনী লড়তে লড়তে সুলতানের একেবারে তাবুর নিকটে পৌঁছে গেছে! আর একটু অগ্রসর হলেই তারা সুলতানের তাবুতে চড়াও হয়ে যাবে! সুলতানের জীবন এখন সম্পূর্ণ হুমকির মুখে।

টনক নড়ে উঠল হাসান জওলাকের। সে বুঝতে পারল, উসমানি বাহিনীর পতন একেবারে নিকটে। সুলতানের জীবন এখন হুমকির মুখে। তড়িৎ বাবুর্চিখানায় প্রবেশ করল হাসান জওলাক। বাবুর্চিদের উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বলল,

'হাতের কাজ ফেলে দাও! দাঁড়াও! নিজেদের দ্বীন-ইসলামকে বাঁচাও! মহামান্য সুলতানকে বাঁচাও। দুশমনেরা একেবারে কাছে এসে গেছে! সুলতানের তাবুর নিকট পৌঁছে গেছে! হাত গুটিয়ে বসে থেকো না!'

কথাগুলো বলার পরপরই হাসান জওলাক বাবুর্চিখানা থেকে একটি কুড়াল ও ধারালো ছুরি হাতে নিয়ে বাজপাখির ন্যায় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ঘোষণা দিয়ে গেল–

'আমি এখন লড়তে যাচ্ছি। তোমাদের যে লড়াই করতে চায়, সে যেন আমাকে অনুসরণ করে!'

হাসান জওলাকের তেজস্বী ঘোষণা আর সাহসী অবস্থান পুরো বাবুর্চিদের মধ্যে প্রেরণা জোয়ার বইয়ে দেয়। ঘুমন্ত চেতনাকে জাগিয়ে দেয়। সকল বাবুর্চি, উট-ঘোড়ার রাখাল, তাবু নির্মাতা ও অন্যান্য কর্মচারীরা হাতে দা-কুড়াল, লাকড়ি ও ছুরি নিয়ে হাসান জওলাকের অনুসরণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে ময়দানে। তারা চলে আসে সুলতানের তাবুর কাছে। কারণ, এই মুহূর্তে সুলতানকে বাঁচানো মানে পুরো উসমানি বাহিনীকে বাঁচানো। সুলতানের মৃত্যু মানে

Scanned by CamScanner

এখানেই উসমানিদের ভরাডুবি। এজন্য ইউরোপীয়রা মরিয়া হয়ে উঠেছে সুলতানের তাবুর কাছে পৌঁছতে।

সুলতানের তাবুর কাছে পৌঁছতে এতক্ষণ তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি অস্ট্রিয়ান ক্রুসেডারদের। কিন্তু এখন এইসব দা-কুড়াল, লাকড়ি আর ছুরিওয়ালা আনাড়ি যোদ্ধাদের সামনে পড়ে রীতিমত হিমশিম খেতে শুরু করল তারা। অল্পক্ষণের মধ্যে পিছু হটতে শুরু করল। বাবুর্চি, রাখাল, শ্রমিক আর কর্মচারীদের এহেন বীরত্বপূর্ণ ভূমিকায় উসমানি সেনাদের ভাঙা মন চাঙ্গা হয়ে উঠল। তারা যেন নতুন করে তাদের বাহু ও পেশিতে বল খুঁজে পেল। নবোদ্যমে শুরু করল পাল্টা আক্রমণ। আঘাতের জবাবে পাল্টা প্রতিঘাত। গর্জে উঠল উসমানিদের সব কামান। মুহূর্তেই পাল্টে যেতে শুরু করল যুদ্ধের পট। ইউরোপীয়রা চোখের সামনে শর্ষেফুল নাচতে দেখতে লাগল।

নিশ্চিত পরাজয়ের মুখ থেকে বিজয়ের দিকে যুদ্ধের পট পরিবর্তনকারী অসীম সাহসী বীর হাসান জওলাক গুরুতর আহত হয়ে কোনোরকমে সুলতানের তাঁবুতে এসে পৌঁছাল। সুলতানের সামনে আসতেই ধপাস করে পড়ে গেল। ক্ষীণকণ্ঠে শুধুমাত্র শেষ এই কথাটা বলতে পারল–'আলহামদুলিল্লাহ! কাফেররা মহামান্য সুলতানের তাবুতে পৌঁছতে পারেনি এবং তাবুকে কলুষিত করতে পারেনি!'

এটাই ছিল হাসান জওলাকের সর্বশেষ উচ্চারিত কথা। এটুকু বলেই সে মাওলার ডাকে সাড়া দেয়। এভাবেই 'জেনোসারি' সৈন্য হওয়ার আশা পূর্ণ হয় 'হাজুভা' যুদ্ধের বীর হাসান জওলাক রাহিমাহুল্লাহর।

যুদ্ধে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে ক্রুসেড বাহিনী। তাদের ৫০ হাজার শত্রুসেনা মারা পড়ে। ২০ হাজার মারা যায় জলাশয় আর ডোবায় পড়ে। বাকিরা পালিয়ে জীবন বাঁচায়। গনিমত হিসেবে পাওয়া যায় শতাধিক কামান। উক্ত যুদ্ধে উসমানিদেরও কয়েক হাজার সৈন্য শাহাদত বরণ করে।

ময়দানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে শুধু লাশ আর লাশ! জমাটবাধা রক্ত আর অসংখ্য লাশ 'হাভুজা'র ময়দানকে বানিয়ে তুলে এক বিভীষিকাময় বধ্যভূমি।[৫৩]

---

৫৩. তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ-৪৩৬, ইয়ালমাজ অজতোয়ানা। *তারিখু সালাতিনি আলে উসমান-৬৩, আহমদ আল কিরমানি।

নীল মসজিদে ছয়টি মিনারের আসল রহস্য

একদিন সুলতান প্রথম আহমাদ প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার 'মুহাম্মাদ আগা'-কে ডেকে বললেন, আমি অপরাপর উসমানি মসজিদ থেকে ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিনন্দন একটি মসজিদ নির্মাণ করতে চাই।

-আজ্ঞে জাঁহাপনা! আমি খুব তাড়াতাড়ি একটি নকশা অঙ্কন করে আপনার সামনে উপস্থাপন করছি।

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আগা মনের মাধুরি মিশিয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুনিপুণভাবে একটি নয়নজুড়ানো মসজিদের নকশা সুলতানের সামনে উপস্থাপন করলেন। মানের বিচারে মুহাম্মাদ আগার নকশাটি ছিল খুবই সুন্দর ও পৃথক বৈশিষ্ট্যের। কিন্তু হলে কী হবে, সুলতান নকশা দেখে সেটি বাতিল করে দিলেন! মুহাম্মাদ আগা ভড়কে গেলেন। তার এতো পরিশ্রমের সাজানো পরিকল্পনা সুলতান এক নিমিষেই প্রত্যাখ্যান করে বসলেন! অথচ তার পক্ষে এর চেয়ে সুন্দর ম্যাপ তৈরি করা মোটেও সম্ভব নয়।

মুহাম্মাদ আগা ভয়ে ভয়ে সুলতানকে জিজ্ঞেস করলেন, আলা হুজুর! অনুগ্রহপূর্বক যদি নকশার ত্রুটিগুলো বলতেন?

-আপনার পরিকল্পিত এই নকশায় দেখা যাচ্ছে মসজিদের মিনারসংখ্যা ছয়টি। মসজিদে নববির মিনারের সংখ্যানুসারে। অথচ দুনিয়ার কোনো মসজিদ মসজিদে নববির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। তুল্যও হতে পারে না। তাই এ নকশা গ্রহণযোগ্য নয়।

বিপাকে পড়ে গেলেন ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আগা। একদিকে নকশাটা সুলতানের মনঃপুত নয়, অপরদিকে এরকম নয়নাভিরাম আরেকটি নকশা তৈরি করাও দুরূহ ব্যাপার। তাহলে এখন কী উপায়? একটি বুদ্ধি খেলে গেল ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আগার মাথায়। তিনি সুলতানকে বললেন,

'জাঁহাপনা! আমাকে যদি একবার মদিনা মুনাওয়ারায় যাবার অনুমতি দিতেন!'

-কেন? মদিনায় গিয়ে কী করবেন আপনি?

Scanned by CamScanner

-যদি হুজরতের মর্জি হয়, তাহলে মসজিদে নববির মিনার আরেকটি বাড়িয়ে সাতটি করে ফেলব। তবুও এই নকশাটি থাকুক। এই নকশা বাতিল করলে এরকম আরেকটি তৈরি করা কঠিন হয়ে যাবে!

সুলতান অনুমতি দিলেন। মুহাম্মাদ আগা মদিনা মুনাওয়ারায় চলে গেলেন। মসজিদে নববিতে আরেকটি মিনার বর্ধিত করে ফেললেন। মসজিদে নববির মিনার হয়ে গেল সাতটি। এখন সুলতান আহমদের পরিকল্পনাধীন চিত্তাকর্ষক ওই মসজিদের মিনার ছয়টা হতে আর কোনো বাধা নেই।

ইস্তাম্বুলে ফিরে এসে ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ সেই আগের নকশাটিই আবার সুলতান আহমদের সামনে মেলে ধরলেন। এবার সুলতান কবুল করে নিলেন। নির্মিত হল 'সুলতান আহমদ জামে মসজিদ'। যার অপর নাম নীল মসজিদ। উসমানি খেলাফতের একটি অন্যতম বৃহৎ ও নয়নাভিরাম জামে মসজিদ।

মসজিদে নববির সপ্তম আরেকটি মিনার আর নীল মসজিদে ছয়টি মিনার নির্মাণের আসল রহস্য এটাই।[৫৪]

৫৪. কাসাসুম মিনাত তারিখিল ইসলামি (ফেইসবুক পেইজ)।

Scanned by CamScanner

সুলতান চতুর্থ মুরাদের হৃদয়ের অশান্তি

একবার সুলতান চতুর্থ মুরাদ (১৬২২-১৬৩৯) মনে প্রচণ্ড অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলেন। প্রধান দেহরক্ষীকে তলব করলেন। খবর পেয়ে দেহরক্ষী এসে হাজির। বিনয়াবনত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী জন্যে তলব করেছেন জাঁহাপনা?

-মনে অশান্তি অনুভব করছি!

-কারণ?

-জানি না!

-কী করা যেতে পারে জাঁহাপনা?

-চলো, একটু বাইরে ঘুরে আসি।

উল্লেখ্য, মাঝেমধ্যে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের হাল-হকিকত জানা ছিল সুলতানের চিরন্তন অভ্যাস।

প্রধান দেহরক্ষীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সুলতান। শহরের এক প্রান্তে লোকালয়ের দিকে রওয়ানা হলেন। হঠাৎ রাস্তায় একটি নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখতে পেলেন। সুলতান দ্রুত কদমে এগিয়ে গেলেন। শরীরে নাড়া দিলেন। কিন্তু না, লোকটি পৃথিবীতে নেই! সুলতান অবাক হয়ে লক্ষ করলেন পথিকরা পাশ কেটে চলে যাচ্ছে অথচ কেউ লাশটির দিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ করছে না! পথচারীদের অবস্থা দেখে অবাক হলেন সুলতান।

তিনি দরাজ কণ্ঠে হাক ছুড়লেন—এই তোমরা এদিকে আসো...

-কী হয়েছে আপনার? ডাকছেন কেন?

-এই ব্যক্তি এখানে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে কেন? আর তোমরাই বা লাশটিকে উঠিয়ে নিচ্ছো না কেন? এই ব্যক্তির পরিচয় কী? এর পরিবার কোথায় থাকে?

- এই লোকটি যিন্দিক, মদখোর, ব্যভিচারী! ,

-তাতে কী হলো? সে কি মুহাম্মাদ সা.'র উম্মত নয়? উঠাও! তার পরিবারের কাছে নিয়ে চলো।

পথচারীরা লোকটিকে উঠিয়ে তার পরিবারের কাছে নিয়ে আসল।

স্বামীর নিথর লাশ দেখতেই স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ল। বিলাপ করে বলতে থাকল, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুক হে আল্লাহর ওলি! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, সত্যিই তুমি একজন সৎকর্মী! সুলতান বিলাপকারিনী মহিলার এই কথাটি শুনছিলেন আর যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত হচ্ছিলেন!

Scanned by CamScanner

কিছুক্ষণ পর লোকজন চলে গেলে সুলতান বিস্ময়ের গোলকধাঁধা থেকে বের হওয়ার জন্য মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার স্বামী কীভাবে আল্লাহর ওলি হয়? অথচ লোকজন বলছে, সে ছিল একজন জিন্দিক, মদখোর, ব্যভিচারি? তাই তারা তোমার স্বামীর লাশকে ছুঁতেও চাচ্ছিল না!'

-আমি তা জানতাম।

এরপর মহিলা তার স্বামীর কাহিনী বলতে শুরু করল, বলল–

'আমার স্বামী প্রতিদিন রাতে মদের দোকানে যেতেন। যতোটুকু পারতেন মদ খরিদ করে ঘরে নিয়ে আসতেন। অতঃপর তা টয়লেটে ঢালতেন আর বলতেন, আমি যতোটুকু সম্ভব ততোটুকু গোনাহের উপকরণ হালকা করছি! তেমনি তিনি বারবনিতা মহিলার ঘরে যেতেন। তাকে তার নির্দিষ্ট বিনিময় দিয়ে দিতেন। বলতেন, এই রাত শুধু আমার ভাগ! দরজা লাগিয়ে দাও! সকাল পর্যন্ত কাউকে ঢুকতে দিবে না। এরপর বাসায় চলে আসতেন আর বলতেন, আলহামদুলিল্লাহ! আমি বারবনিতা ও নষ্ট যুবকদের কিছুটা হলেও গোনাহকে কম করালাম!'

স্ত্রী আরও বলল, 'লোকজন তাকে মদ খরিদ করা এবং বারবনিতার ঘরে যেতে দেখে তার ব্যাপারে মন্তব্য করত। আমি একবার তাকে বললাম, আপনি যদি মারা যান, তাহলে তো আপনাকে কাফন-দাফন ও জানাযা পড়ার মতো কোনো মুসলমানকে পাওয়া যাবে না! তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, তুমি এই ভয় করছো? ইনশাআল্লাহ আমার জানাযার নামাজ পড়বেন স্বয়ং সুলতান, ওলামা আর আউলিয়াগণ!'

সব শুনে হু হু করে কেঁদে উঠলেন সুলতান! বললেন, 'কসম আল্লাহর! তিনি সত্য বলেছেন। আমিই সুলতান মুরাদ। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমিই তাকে গোসল দেব, কাফন-দাফন করব এবং জানাযার নামাজও পড়াব।'

সত্যিই পরদিন সুলতান, ওলামা ও আউলিয়ায়ে কেরাম ওই ব্যক্তির জানাযার নামাজে উপস্থিত ছিলেন।[৫৫]

---

৫৫. মাযকারাতুস সুলতান মুরাদ আর রাবে (তুর্কি ভাষায় লিখিত সুলতান চতুর্থ মুরাদের স্মৃতিকথা)।
*আল মুজতামা মাজাল্লাতুল মুসলিমিন ফিল আলাম (আরবি ম্যাগাজিন, ২১/১১/২০১৫ সংখ্যা)।

Scanned by CamScanner

ঘুষখোর কর্মকর্তাকে পাকড়াওয়ের কৌশল

সুলতান চতুর্থ মুরাদের কাছে খবর পৌঁছল, ইস্তাম্বুল শহরের প্রধান কর্মকর্তা শহরবাসীর কাছ থেকে ঘুষ নিচ্ছেন। খবরটা শুনে সুলতান রেগে গেলেন। ওই প্রধান কর্মকর্তার পিছনে একজন গোয়েন্দা লাগিয়ে দিলেন।

একমাস পর সুলতান গোয়েন্দাকে ডেকে পাঠালেন। তার কাছে রিপোর্ট চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো, কী জানতে পারলে'?

-জাঁহাপনা! দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরও আমি সন্দেহজনক কিছুই পাইনি। মনে হচ্ছে, ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অপবাদ বৈ কিছু নয়!

-হুঁ, তবে আমি মনে করি, শহরবাসী শুধু শুধু অভিযোগ দিতে যাবে না। আগুন ছাড়া ধোঁয়া দেখা যায় না। তুমি ঠিকমত অনুসন্ধান করতে পারোনি। আচ্ছা, এবার যেতে পারো।

এবার সুলতান নিজেই গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ডেকে পাঠালেন ওই অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে। কিছুক্ষণ পর কর্মকর্তা সুলতানের সামনে এসে হাজির। সুলতান কর্মকর্তার হাতে একটি মুদ্রার থলে দিয়ে বললেন, 'আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে পাঠাচ্ছি। আগামীকাল আয়াসুফিয়া মসজিদে ফজরের সালাত আদায় করবেন। সেখানে অমুক খুঁটির নিচে বসা একজন দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তি দেখতে পাবেন। তাকে এই থলেটি দিয়ে বলবেন, সুলতান আপনাকে এই থলেটি দান করেছেন।'

সুলতানের আদেশ পেয়ে কর্মকর্তা পরদিনই রওয়ানা করল। আয়াসুফিয়া মসজিদে ফজরের সালাত আদায় করে ওই ব্যক্তিকে খুঁটির নিচে দেখতে পেল। সামনে এগিয়ে এসে থলেটি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই নিন, সুলতান দিয়েছেন আপনাকে'।

-আল্লাহ সুলতানকে দীর্ঘজীবী করুন। তাকে সাহায্য করুন।

Scanned by CamScanner

পরদিনই সুলতান শহরের ওই প্রধান কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করার শাহি ফরমান জারি করলেন। খবরটি শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। শহরের অধিবাসীরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। তারা যারপরনাই আনন্দিত হল। কারণ, তারা এই ঘুষখোর কর্মকর্তার খপ্পর থেকে রেহাই পেয়েছে। উসমানি খেলাফতের মন্ত্রীরা আশ্চর্য হলেন! সুলতান তো কাউকে বিনা অপরাধে গ্রেফতারির পরোয়ানা জারি করতে পারেন না! ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগই প্রমাণিত হল না আর সুলতান তাকে গ্রেফতারের আদেশ দিয়ে দিলেন!

বিষয়টা খোলাসা করলেন সুলতান। বললেন,
'আমি ওই কর্মকর্তাকে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রার থলে দিয়ে আয়াসুফিয়া মসজিদে ফজরের সালাত আদায় করে এক দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিকে দান করতে বলেছিলাম। ওই দরিদ্র ব্যক্তি আমার খাস লোকদের একজন ছিল। সে ছদ্মবেশ ধারণ করে বসেছিল। কিন্তু এই কর্মকর্তা থলের মধ্যে মাত্র পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা ভরে ওই দরিদ্র ব্যক্তিকে দিয়েছিল। মানে সে পঁয়তাল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। তাই আমি বোঝে নিই, এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য। সে একজন লোভী, খেয়ানতকারী।'[৫৬]

৫৬. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-৯৮, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

Scanned by CamScanner

স্বর্ণভর্তি জুতো

ছেঁড়া কাপড় পরা, ধুলোমলিন চেহারার একটি বালক। চেহারায় দারিদ্রতার ছাপ স্পষ্ট। হাড়কাঁপুনি ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পানির মটকা বহন করে গুটিসুটি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে ক্রুয়েশিয়ার কোনো এক শহরের কর্দমাক্ত গলি দিয়ে। জুতোহীন নগ্নপদে বালকটিকে এ অবস্থায় খুবই অসহায় লাগছিল। বালকটির এ অবস্থা দেখে মধ্যবয়সী উসমানি এক মহিলার হৃদয়ে দয়া হল। মহিলা বালকটিকে ডেকে এনে একজোড়া সুন্দর জুতো দিয়ে বলল, 'জুতোজোড়া পরেই তুমি বাড়ি যাও'!

সুন্দর জুতোজোড়া পেয়ে তো বালক আনন্দে আটখানা! পুরো পৃথিবীর খুশি যেন ধরা দিয়েছে তার হাতের মুঠোয়! মহিলার প্রতি কৃতজ্ঞতার একটা চাহনি দিয়েই সম্পূর্ণ আলাদা একটি ভঙ্গিতে হাঁটা দিল বাড়ির পথে। চোখের আড়াল হওয়ার আগ পর্যন্ত মহিলা বালকটির দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে রইল নিজ কুটিরের খুঁটি ধরে।

দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে। এভাবেই কেটে গেল বেশ কটি বছর। কালের আবর্তনে মধ্যবয়সী ওই মহিলা এখন বৃদ্ধা। মাথায় একগাছি চুলও আর কালো নেই। জীর্ণ-শীর্ণ দেহ। দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ। একদিন ঘরের ভেতর কী যেন একটা কাজ করছিলেন। ইত্যবসরে দরজায় কারো করাঘাতের আওয়াজ শুনতে পেলেন। একটা দুটা নয়; বেশ কয়েকটা। চোখ তুলে তাকালেন দরজার দিকে। বাহিরের করাঘাতে ভেতরের কড়া এখনও দুলছে। মনে মনে ভাবলেন, কে এলো এই অসময়ে? আচ্ছা দেখিতো-বলে পা দুটো টেনে টেনে কোনোরকম গিয়ে পৌঁছলেন দরজার কাছে। ছিটকিনিটা খুলে দরজা খুলতেই তার চোখ দুটো ছানাবড়া! স্বর্ণভর্তি একজোড়া জুতো পড়ে আছে দরজার পাশে! তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে অপরিচিত এক নওজোয়ান!

হ্যাঁ, এই নওজোয়ান হলেন সেই নগ্নপদের বালক জুসেফ। কালের আবর্তে যিনি আজ উসমানি খিলাফতের প্রসিদ্ধ নৌ-সেনাপতি ইউসুফ পাশা। 'খানা' বিজেতা। ক্রুয়েশীয় বংশোদ্ভূত। সুলতান প্রথম ইবরাহিমের (১৬৪০-১৬৪৮) কন্যা শাহজাদি ফাতেমার স্বামী।

উল্লেখ্য, ক্রুয়েশিয়া ১৫৪০-১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উসমানি খেলাফতের শাসনাধীন ছিল।[৫৭]

---

৫৭. আরশেফুত তারিখিল উসমানি-অটোম্যান হিস্টোরি আরকাইভ (ফেইসবুক পেইজ)।

আমেরিকাও উসমানিদের কর প্রদান করত

১৭৮৩ সাল। উসমানি সুলতান প্রথম আবদুল হামিদ (১৭৭৪-১৭৮৮) এর শাসনকাল। আমেরিকান নৌবাহিনীর জাহাজ এই প্রথম আন্তর্জাতিক জলসীমায় প্রবেশ করল। ১৭৭৬ সালে আমেরিকা নিজেকে ইংল্যান্ডের অধীন হতে মুক্ত করে আমেরিকান পতাকা উড়িয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সমুদ্রে বিচরণ করতে শুরু করল। কিন্তু উচ্ছ্বাস বেশিদিন টিকল না। আলজেরিয়ার কাছাকাছি, তৎকালীন বিশ্বের সুপার পাওয়ার উসমানি খেলাফতের নৌবাহিনীর হাতে দুই বছরের মাথায় ১৭৮৫ সালের জুলাই মাসে আমেরিকান জাহাজ অবৈধ প্রবেশের দায়ে ধরা পড়ল। পরবর্তীতে সুলতান তৃতীয় সালিম (১৭৮৮-১৮০৮) এর শাসনকালে ১৭৯৩ সালে আরও ১১টি জাহাজ ধরা পড়ে। উসমানি খেলাফতের নৌবাহিনীর সদস্যরা জাহাজগুলোকে নিয়ে এসে আলজেরিয়ার উপকূলে নোঙর করে রাখে।

উসমানি নৌবাহিনীর মোকাবিলার জন্য স্টিল নির্মিত জাহাজ তৈরি করার জন্য আমেরিকার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনকে ৭০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করার অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু বাস্তবতা হল, উসমানি নৌবাহিনীর মোকাবিলার মতো সামর্থের ধারেকাছেও ছিল না আমেরিকান নৌবাহিনী। বরং উসমানি নৌবাহিনীর মোকাবিলা করতে হলে তখন আমেরিকার আরও কয়েক বছর পর্যন্ত সময় ব্যয় করে সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করে তারপর উসমানি নৌবাহিনীর মোকাবিলা করার সাহস করতে হতো।

ফলে দুই বছরের মাথায় ১৭৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর খেলাফতের সাথে এক চুক্তি করতে বাধ্য হয় আমেরিকা! এই চুক্তির নাম ছিল 'বারবারি চুক্তি'। এ ধরনের নামকরণের কারণ হচ্ছে, উসমানি খেলাফতের উত্তর আফ্রিকান প্রদেশের নাম ছিল 'বারবারি'। যার মধ্যে আলজেরিয়া, তিউনিস এবং ত্রিপোলি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

Scanned by CamScanner

আমেরিকা উসমানি খেলাফতের সাথে বাইশটি শর্তে চুক্তি করে। তন্মধ্যে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল নিম্নরূপ–

১. আমেরিকাকে এককালীন ৯ লাখ ৯২ হাজার ৪৩৬ ডলার পরিশোধ করতে হবে।

২. ধৃত জাহাজসমূহ ফেরত দেয়া হবে এবং আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরে আমেরিকাকে প্রবেশাধিকার দেয়া হবে।

৩. বিনিময়ে আমেরিকান সরকার তৎক্ষণাৎ উসমানি খেলাফতকে ৬ লাখ ৪২ হাজার ডলার সমমূল্যের স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করবে।

৪. আমেরিকাকে বার্ষিক ১২ হাজার উসমানীয় 'লিরা' সমমূল্যের স্বর্ণমুদ্রা কর হিসেবে দিতে হবে। এই বর্ষপঞ্জি ইসলামিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী গণনা করা হবে।

৫. আমেরিকার ধৃত নাবিকদেরকে ফেরত নেয়ার জন্য ৫ লাখ ৮৫ হাজার ডলার পরিশোধ করতে হবে। উপরন্তু খেলাফতকে স্টিল নির্মিত কিছু জাহাজও উপহার দিতে রাজি হয় আমেরিকা।

এ চুক্তি হয়েছিল তুর্কি ভাষায় এবং আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন নিজে এতে সই করেছিলেন। আমেরিকার ইতিহাসে এটাই একমাত্র চুক্তি, যেখানে আমেরিকা ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এবং কোনো জাতিকে বার্ষিক কর প্রদানে বাধ্য হয়েছে।

এ চুক্তি ১৮১২ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল।[৫৮]

---

৫৮. ইসলামস্টোরি ডটকম।

Scanned by CamScanner

এক ইঁচড়েপাকা ছেলের গল্প

উসমানি সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ (১৮০৮-১৮৩৯)। সুলতান প্রথম আবদুল হামিদের ছেলে। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলের 'তোপকাপি' রাজপ্রাসাদে তার জন্ম। পিতার মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল মাত্র চার বছর। চাচা সুলতান তৃতীয় সালিম নিজ সন্তানের মমতা দিয়ে বড় করে তুলেন তাকে। গড়ে তুলেন উপযুক্ত মানুষ হিসেবে। শিক্ষা লাভ করেন তোপকাপি রাজপ্রাসাদের মাদরাসায়। ১৮০৮ সালে চব্বিশ বছর বয়সে সমাসীন হন উসমানি খেলাফতের মসনদে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বীর সাহসী, কবি ও লিপিকার। ন্যায়পরায়ণতার সুবাধে প্রজারা তাকে ভূষিত করেছিল 'আদলি' বা 'ন্যায়পরায়ণ' উপাধিতে ।

তার মাঝে ছিল খলিফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. ও অন্যান্য উসমানি সুলতানদের গুণাবলি। রাস্তা-ঘাট, অলি-গলি ঘুরে প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন, খোঁজখবর নিতেন। তাদের সুখ দুঃখে জানার চেষ্টা করতেন।

একবার তিনি সুন্দর-সুশ্রী এক বালকের সাথে রসিকতা করছিলেন। পিচ্চিটা ছিল ইঁচড়েপাকা। অকালেই পেকে বসেছে যেন! মুখে কথার খৈ ফুটে! খলিফা তার সাথে কথা বলে ধী-শক্তি ও বিচক্ষণতা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। মুগ্ধ হয়ে পকেট থেকে একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে বাড়িয়ে ধরলেন পিচ্চির দিকে। বললেন, 'নাও, তোমাকে দিলাম'!

-না! এটি আমি নেব না।

-নেবে না কেন?

-আম্মা মনে করবেন, আমি কোথাও থেকে চুরি করেছি!

সুলতান মুচকি হেসে বললেন, তোমার আম্মাকে বলো, সুলতানই আমাকে মুদ্রাটি দিয়েছেন।

-জাঁহাপনা! তাহলে তো আরও বড় সমস্যা! আম্মা কিছুতেই এটা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। তিনি বলবেন, 'সুলতানের মতো ব্যক্তি তোমাকে এতো ছোট অঙ্কের মুদ্রা দিতে পারেন না!'

পিচ্চিটার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখে সুলতান খুব হাসলেন। কী আর করা, শেষ পর্যন্ত তাকে এক থলে স্বর্ণমুদ্রা দিতেই হলো![৫৯]

---

৫৯. আল ইমবারাতুরিয়্যাতুল উসমানিয়্যাহ-অটোম্যান এম্পিয়ার (ফেইসবুক পেইজ।

Scanned by CamScanner

জেনোসারি ও পাগলা দলের অজানা অধ্যায়

তখন উসমানি খেলাফত ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ সামরিক শক্তি। সেনাবাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্দান্ত ইউনিটটির নাম ছিল 'জেনোসারি'। তারা ছিল পদাতিক বাহিনীর একটি ডিভিশন। এরা যুদ্ধবিদ্যায় এতোটাই পারদর্শী ছিল যে, এদের নাম শুনলেই শত্রুরা ঢোক গেলা শুরু করত। এরা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির। ঢাল-তলোয়ার ছিল তাদের জীবনের অনুসঙ্গ। যুদ্ধহীন জীবন তাদেরকে হতাশ করে তুলত। অস্থির হয়ে উঠত! এমনকি শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যেই লড়াই বাঁধিয়ে দিত!

জেনোসারিরাই ছিল উসমানি সেনাবাহিনীর শক্তির হৃদপিণ্ড। এরা ছিল বিশ্বস্ত ও নিবেদিতপ্রাণ। সুলতান বা খলিফাকে এরা মুসলিম বিশ্বের অভিভাবক মনিবের মতো মনে করতো। সুলতানগণও তাদেরকে আলাদা মূল্যায়ন করতেন।

এই ইউনিটটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দ্বিতীয় উসমানি সুলতান উরখান বিন উসমান (১৩২৬-১৩৬০)। ইয়াতিম ও অভিভাবকহীন মুসলিম শিশু ও যুদ্ধবন্দি খ্রিস্টান শিশুদের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি উসমানি সামরিক বিভাগের অধীনে লালনপালন করতেন। পরবর্তী সকল উসমানি সুলতান বা খলিফাগণও তার এ রীতিকে অনুসরণ করে এরকম শিশুদেরকে সামরিক বিভাগের অধীনে লালনপালন করতেন। এদেরকে ছোটবেলা থেকেই সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধিবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলা হতো। বাইরের দুনিয়ার সাথে তাদের কোনোই সম্পর্ক থাকতো না। যুদ্ধ, লড়াই আর সেনাছাউনি ছাড়া দুনিয়ার আর কিছুই তারা জানত না। বিয়ে-শাদি নিষিদ্ধ ছিল। শুধু সুলতান দ্বিতীয় সালিম তাদেরকে বয়স্কা নারী বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের শাসনকালে জেনোসারিরা বিদ্রোহ করে বসলে অবস্থার ভয়াবহতা অনুভব করে সুলতান অন্যান্য সেনা ও তুর্কি জনসাধারণকে এদেরকে প্রতিহত করার আহ্বান জানান। উসমানি সেনাবাহিনী ও তুর্কি জনসাধারণ এদেরকে নির্মূল করে। তখন একসাথে তাদের ছয়হাজার সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। এই জেনোসারিদের নির্মূলের পর কার্যত উসমানি সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে যায়। উসমানি খেলাফতও দ্রুত পৌছতে শুরু করে পতনের দ্বারপ্রান্তে।

Scanned by CamScanner

জেনোসারি ও সাধারণ সিপাহিদের পাশাপাশি উসমানি সেনাবাহিনীতে ছিল আরেকটি সেনাদল। এ দলটি সম্পূর্ণ যুবকদের দ্বারা গঠিত ছিল। এদের বয়স থাকত বিশ থেকে পঁচিশ বছর। এ দলের নাম ছিল, 'পাগলা দল'! উসমানিরাই এ নাম দিয়েছিল। কারণ, এ দলের সেনাদের সুস্থ জ্ঞান বলতে কিছুই ছিল না। এরা অদ্ভুত পোশাক পরিধান করত। যুদ্ধের ময়দানে প্রদর্শন করত বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা। এদের প্রধান কাজ ছিল সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে অবস্থান করে শত্রুদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করা। তাদের গ্রেফতার করা।

প্রসিদ্ধ তুর্কি পর্যটক 'আউলিয়া চলপি' তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'সিয়াহিতনামা'য় এদের ব্যাপারে লিখেন, 'এদের পোশাক ছিল সিংহ, চিতা, হায়েনা ও ভল্লুকের লোম দিয়ে তৈরি! অনেকেই আবার পিঠে ও বগলে শকুনের ডানা নিয়ে ঘুরত! মাথার চুল থাকত লম্বা লম্বা। তদুপরি এরা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী।'

এ বাহিনীতে যোগদান করা সহজ ব্যাপার ছিল না। শুধু ভীষণ শক্তিশালী যুবকদেরকেই এ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। যুদ্ধ ও মৃত্যুকে ভয় পেলে হতো না। যুদ্ধের ময়দানে আট থেকে বিশজন শত্রুকে হত্যা করে নিজ বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ করে দেখাতে হতো। যুদ্ধের ময়দানে এভাবে বীরত্ব ও সাহসিকতার দৃষ্টান্ত পেশ করার পর সামরিক মহড়ায় আবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতো।

পাগলা দলের সদস্যদের নির্বাচন করা হতো বেশিরভাগই তুর্কি, বসনিয়ান ও সার্বিয়ান যুবকদের মধ্য থেকে। যুদ্ধের ময়দানে এরা সবসময় ছোট তলোয়ার, বর্শা ও বর্ম ব্যবহার করত। এদের নিজস্ব পতাকায় লেখা থাকত, "প্রত্যেক মানুষই তার ভাগ্যের লিখন নিয়ে বাঁচে"। এরা কোনোপ্রকার অস্ত্র ছাড়াই লড়তে পারত এবং শত্রুদের থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারত। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এরা ছিল চপেটাঘাতে বিশেষ পারদর্শী। এক চপেটাঘাতেই তারা শত্রুকে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে দিতে পারত! তাদের এই চপেটাঘাত 'উসমানি চপেটাঘাত' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাতকে লোহার মতো শক্ত করে তোলা হতো।

অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্রোহের কারণে ১৪২৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ এ দলকেও চিরতরে বন্ধ করে দেন।[৬০]

---

৬০. তুর্কপ্রেস ডটকম। *ইসলামস্টোরি ডটকম।

Scanned by CamScanner

উসমানিদের অতিথিপরায়ণতা

উসমানিরা মেহমানকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। মেহমানদারি করতে কোনো কমতি করতেন না। অতিথিপরায়ণতায় ছিলেন প্রবাদপ্রতিম। মেহমানের কদরকে তারা ইবাদত মনে করতেন। মনে করতেন মেহমান রিজিক নিয়ে আসে। মেহমানকে যতই কদর করা হবে আল্লাহ ততই রিজিক বাড়িয়ে দেবেন। প্রতিটি ঘরে মেহমান-মুসাফিরের জন্য থাকত আলাদা কামরা। কামরার নাম থাকত 'গাঁয়ের কামরা'। সেখানে পরিবেশন করা হতো মেহমানের খানাপিনা।

আজও তুরস্কে এই প্রথা বিদ্যমান। তুর্কিরা উসমানিদের থেকে এই সংস্কৃতিটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। তারা এখনও ঘর তৈরি করার সময় মেহমানের জন্য আলাদা একটি কামরা তৈরি করে। কামরাটি ঘরের অন্যান্য কামরা থেকে একটু বেশি বড় ও শানদার করে তৈরি করা হয়। গৃহকর্ত্রী প্রতিদিন এই কামরাটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর সাজিয়ে পরিপাটি করে রাখেন হঠাৎ করে এসে পড়া মেহমানের জন্য!

তুরস্কের একটি ঘরে একটি চিত্র পাওয়া যায়। যা ওই ঘরের মেহমানের কামরায় সাঁটা ছিল। চিত্রের মধ্যে তুর্কি ভাষায় লেখা রয়েছে দুটি চরণ,
"হে মুসাফির! ওদিক দিয়ে আছে কিবলা, নামাজ পড়ে নাও আগে,
এই হল চিলিমচি, ওই ঝুলে আছে রুমাল আর এই পানি আছে জগে।"
কোনো মেহমান উসমানি কোনো ঘরে প্রবেশ করলে গৃহকর্তা মেহমানকে বরণ করে নিয়ে বলতেন, দুরাকাত নামাজ পড়ে নিন। নামাজ শেষ হতে না হতেই এসে যেতো কফি আর পানির গ্লাস। মেহমান সালাম ফিরিয়েই দেখতে পেতেন, হাতছানি দিয়ে ডাকছে স্বচ্ছ স্ফটিকের গ্লাসে নির্মল পানি। পাশেই ধোঁয়া ওঠা আরেকটি কফির কাপ তাকে হাত বাড়াতে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে!

মেহমান যদি আগেই কফি পান করে নিত, তাহলে মেজবান বোঝে নিত মেহমান খাবার খেতে ইচ্ছুক নন। আর পানি পান করলে তারা বোঝে নিত, মেহমান ক্ষুধার্ত। ফলে মেহমানের জন্য যথাসম্ভব ভালো, মজাদার ও রুচিসম্মত খাবারের আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ত। এর ফাঁকে মেহমান কিছু বোঝে ওঠার আগেই মেজবান দস্তরখান নিয়ে হাজির হয়ে যেত। এ পদ্ধতি অবলম্বন করার কারণ ছিল—মেহমান যেন নিজ পক্ষ থেকে খাওয়ার চাহিদা পেশ করতে লজ্জাবোধ না করে। আজও তুর্কিদের মাঝে এই কৃষ্টি বিদ্যমান।[৬১]

---

৬১. তূর্কপ্রেস ডটকম। *তুর্কিয়া আল উসমানিয়্যাহ (ফেইসবুক পেইজ)।

Scanned by CamScanner

সম্রাজ্ঞীর প্রসব বেদনা

উসমানি খেলাফতের কোনো সুলতানের কাছে রাজপ্রাসাদের অন্দরমহল থেকে তার অর্ধাঙ্গিনী-সম্রাজ্ঞীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়ে গেছে মর্মে সংবাদ পৌছার সাথে সাথে সুলতানরা কুরআন তেলাওয়াত শুরু করে দিতেন। তারা কুরআন তেলাওয়াত করতেন আর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষা করতেন, ভেতর থেকে কখন এই খবর আসে–খেলাফতের রাজপ্রাসাদ আলোকিত করে তার কোলজুড়ে শুভাগমন ঘটেছে একটি ফুটফুটে সন্তানের।

একবার সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের অন্দরমহল থেকে সংবাদ আসে, সম্রাজ্ঞীর প্রসব বেদনা শুরু হয়ে গেছে। সংবাদটি শুনতেই সুলতান কুরআন তেলাওয়াতে বসে যান। তিনি যখন সুরা মুহাম্মাদ শেষ করে সুরা আলফাতহ শুরু করেছেন, ঠিক তখনই ভেতর থেকে খবর আসে–তার একটি পুত্রসন্তান দুনিয়াতে আগমন করেছে। সুলতান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। পুত্রের নাম রাখলেন 'মুহাম্মাদ', আর বললেন, 'ইনশাআল্লাহ সে অনেক অঞ্চল বিজয় করে খেলাফতের আয়তনকে আরও বর্ধিত করবে'।

হ্যাঁ, এই মুহাম্মাদই হলেন সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী। তার হাতেই বিজিত হয়েছিল কনস্টান্টিনোপল। তার হাতেই প্রতিফলিত হয়েছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যতবাণী।

তেমনি একবার সুলতান প্রথম সালিমের কাছে খবর এলো, সম্রাজ্ঞীর প্রসব বেদনা শুরু হয়ে গেছে। সুলতান কুরআন তেলাওয়াতে বসে পড়লেন। যখন তিনি সুরা আন-নামল এর "ইন্নাহু মিন সুলায়মানা ওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"- আয়াত পর্যন্ত পৌছলেন, তখন অন্দরমহল থেকে সুসংবাদ আসল, আল্লাহ তাকে একটি পুত্রসন্তান দান করেছেন। সুসংবাদটা শুনে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করত নবজাতকের নাম রাখেন 'সুলায়মান'।

হ্যাঁ, এই সুলায়মানই হলেন সুলতান 'সুলায়মান কানুনি'। দ্য মেগনিফিসেন্ট গ্রেট। আর এ জন্যেই সুলতান সুলায়মান কানুনি কোনো চিঠিপত্র লিখতে গেলে এভাবে শুরু করতেন- "ইন্নাহু মিন সুলাইমানা ওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম..."[৬২]

---

৬২. আরশেফু-তারিখিল উসমানি-অটোম্যান হিস্টোরি আরকাইভ (ফেইসবুক পেইজ)

Scanned by CamScanner

মদিনাওয়ালার নামে যার অন্তর উৎসর্গিত

উসমানি খলিফা 'আবদুল আজিজ' (১৮৬১-১৮৭৬)। সব খলিফার মতই যার অন্তর ছিল মদিনাওয়ালার নামে ফিদা। মক্কা-মদিনার নাম শুনতেই যার অন্তর হয়ে উঠত দিওয়ানা। শেষ বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিছানায় পড়ে রইলেন। উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতাটাও নেই। ইতোমধ্যে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ একটি চিঠি এসে পৌছাল। দরবারের লোকজন দ্বিধায় পড়ে গেলেন, অসুস্থ খলিফাকে অবগত করবেন কি না। আবার মদিনা মুনাওয়ারাহর ব্যাপারে খলিফার অনুভূতি, দুর্বলতা ও সংবেদনশীলতা তাদের জানা ছিল। শেষ পর্যন্ত তারা চিঠিটি সুলতানের কাছে প্রেরণ করলেন।

উজিরে আজম সুলতানের নিকট গিয়ে বললেন, 'হজরত! মদিনা মুনাওয়ারা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি এসেছে।'

কথাটা শোনার সাথে সাথে অশ্রুসজল হয়ে উঠে খলিফার চোখ। মুক্তোদানার মতো গড়িয়ে পড়ে অশ্রুবিন্দু। উজিরে আজমকে বললেন, 'তার নির্দেশের পূর্বে যেন চিঠি পাঠ করা করা না হয়।'

এরপর উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বলেন, 'আমাকে উঠাও! মদিনা মুনাওয়ারা থেকে চিঠি এসেছে, আর আমি শুয়ে শুয়ে শুনব–তা হতেই পারে না!'

লোকেরা তাকে তুলে দাঁড় করাল। মারাত্মক অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সুলতান কোনোরকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিঠি শ্রবণ করলেন।

সুলতান আবদুল আজিজ এতোটাই মদিনাপ্রেমী ছিলেন যে, মদিনা মুনাওয়ারা থেকে আগত কোনো ফাইল বা কাগজপত্র ওজু ছাড়া হাতে নিতেন না। বলতেন, এই কাগজপত্রে লেগে আছে মদিনার ধুলোবালি! লেগে আছে মদিনার সুবাস! যে মদিনার ধুলিতে শুয়ে আছেন মানবতার মুক্তির দূত প্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মদিনা থেকে আগত ফাইল বা কাগজপত্রে সর্বপ্রথম চুমো খেতেন। কপালে রাখতেন। নাসিকা ঘর্ষণ করে ঘ্রাণ শুঁকতেন। অতঃপর খুলে পড়তেন।[৬৩]

---

৬৩. তুর্কপ্রেস ডটকম। *তুরকিয়া আল উসমানিয়্যাহ।

Scanned by CamScanner

লালকার্ড সাদাকার্ড সমাচার

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ (১৮৭৬-১৯০৯)। সুলতান আবদুল আজিজের ভাতিজা। উসমানি খেলাফতের নিভু নিভু সময়ে আসীন হয়েছিলেন খেলাফতের মসনদে। শেষদিকের দুর্বল সুলতানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একজন হুশিয়ার ও কঠোর সুলতান। ছিলেন সুলতান প্রথম সালিম ও সুলায়মান কানুনির প্রতিবিম্ব। নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলেন খেলাফতের হারানো ঐতিহ্য ও শৌর্য-বীর্যকে ফিরিয়ে আনতে। তাই তৈরি হয়েছিল ঘরে বাইরে তার অগণন দুশমন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি হেরে যান। পদচ্যুত হন সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক ও পয়সার বিনিময়ে নিজেকে বিকিয়ে দেয়া দালালচক্রের চক্রান্তের শিকার হয়ে। মূলত সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের অপসারণের পরই ধ্বস নেমে এসেছিল উসমানি খেলাফতের ভিতে।

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ জায়নিস্টদের জন্য ছিলেন সাক্ষাৎ যমদূত। তার কঠোর নীতির কারণে ইয়াহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনের মাটিতে পা জমানো মুশকিল হয়ে উঠেছিল! বিধিবদ্ধ নিয়মে বেঁধে দেওয়া দিনের মধ্যেই ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে যেতে হতো ইয়াহুদিদের।

বিংশ শতাব্দীর শেষদিকের ফিলিস্তিনের প্রখ্যাত কলামিস্ট ও সাংবাদিক 'ইউসুফ হান্না আল ঈসি' ৩ সেপ্টেম্বর ১৯১১ তারিখে তার ডায়রিতে ফিলিস্তিনের 'হাইফা'র স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে লিখেন–

> 'ফিলিস্তিনের সমুদ্রবন্দরের কর্মকর্তাদের গায়ে থাকত বিশেষ ইউনিফর্ম। সমুদ্র দিয়ে আসা ভীনদেশীদেরকে সহজে সনাক্ত করার জন্য খেলাফত তা বাধ্যতামূলক করেছিল।
>
> ফিলিস্তিনে বসবাসের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ইয়াহুদিদের কেউ হাইফার সমুদ্রবন্দরে আগমন করলে কর্মকর্তারা তার কাছ থেকে বৈদেশিক পাসপোর্ট নিয়ে নিত এবং তাকে একটি 'লালকার্ড' ধরিয়ে দিত। সেই 'লালকার্ড' প্রদানের অর্থ এই ছিল যে, কার্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি শর্তযুক্ত ও সাময়িক অবস্থানের অনুমতিপ্রাপ্ত। নির্দিষ্ট সময়ের পর তাকে ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে যেতে হবে। অতঃপর পর্যটন বা প্রয়োজন শেষে যখন ফিরে যাওয়ার জন্য সমুদ্রবন্দরে জাহাজের সিঁড়িতে পা রাখত, তখন বন্দরের কর্মকর্তারা তার বৈদেশিক পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিত এবং প্রদত্ত 'লালকার্ড' ফিরিয়ে নিত।'

Scanned by CamScanner

ড. মুহাম্মাদ ঈসা সালিহিয়্যাহ আরও লিখেন–

> '১৯৪৮ সালের পর ব্রিটেন সরকার ফিলিস্তিনে বসবাসের জন্য ইয়াহুদিদের 'সাদা কার্ড' প্রদানের আইন প্রণয়ন করেছিল। এই 'সাদাকার্ড' ছিল উসমানিদের সেই 'লালকার্ড'র বিপরীত যা উসমানি প্রশাসন কর্তৃক পর্যটক বা আল আকসা অবলোকনকারী ইয়াহুদিকে ফিলিস্তিনে তিনমাসের জন্য বসবাসের অনুমতি হিসেবে প্রদান করত। তিনমাস পর কোনো প্রকার বিলম্ব বা বসতি স্থাপনের মোটেই সুযোগ ছিল না। ব্রিটেন সরকার ইয়াহুদিদের এই 'সাদাকার্ড' ফিলিস্তিনে চলে আসার এবং বসতি স্থাপনের জন্য প্রদান করত।'

ইতিহাসের দুই টুকরো খবর। একটি লাল কার্ডের। অপরটি সাদা কার্ডের। লাল কার্ডটি ছিল উসমানি খিলাফতের সময়কার, আর সাদা কার্ডটি ছিল উসমানি খিলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর। লাল কার্ডের সাথে ছিল মুসলিম উম্মাহর ইজ্জত, শৌর্য-বীর্য ও প্রতাপের সম্পর্ক আর সাদা কার্ডের সাথে মুসলিম উম্মাহর অপমান, অধঃপতন ও দুর্বলতার সম্পর্ক। আজকের আল আকসা ও ফিলিস্তিনিদের অসহায়ত্বই এর জ্বলন্ত প্রমাণ।[৬৪]

---

৬৪. মদিনাতুল কুদস-৭৭, ড. মুহাম্মাদ ঈসা সালিহিয়্যাহ।

Scanned by CamScanner

যেমন কুকুর তেমন মুগুর

আল্লামা আহমদ ওয়াফিক পাশা ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সময়ে উসমানি খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ 'বুরসা'র গভর্নর। এর আগে তিনি ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের শাসনামলে উসমানি খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ একজন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ইউরোপের দেশগুলোর রাজধানীতে উসমানি খেলাফতের পক্ষ থেকে কূটনীতিবিদ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রত্যুৎপন্নমতি তথা উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী। হঠাৎ করেই যে কাউকে লা-জবাব করে দেওয়ার মতো তার বৈশিষ্ট্য ছিল।

উল্লেখ্য, তখন উসমানি খেলাফতের নারী ও যুবতীরা পরিপূর্ণ শরিয়াহসম্মত পর্দা করত। দুই পাট্টাওয়ালা ঢিলেঢালা বোরখা পরত। চোখ দুটোও জালিকাপড়ে ঢাকা থাকত। বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই মেয়েরা পর্দা পালন করত। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তো তার মেয়ে আয়শাকে এগারো বছর বয়সেই নেকাবসহ বোরখা পরার আদেশ দিয়েছিলেন।

একবার ইউরোপের জনৈক কূটনীতিবিদ এক অনুষ্ঠানে আল্লামা আহমদ ওয়াফিক পাশাকে বলল,
'প্রাচ্যের মহিলারা কেন পুরো জীবন ঘরে হিজাব পরে বসে থাকে, সকল প্লাটফর্মে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে না?

কূটনীতিবিদ কথাটা প্রাচ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে চলে আসা পর্দাপ্রথার উপহাস করতে গিয়ে বলেছিল।
আল্লামা আহমদ ওয়াফিক পাশা জবাব বলেন,
'কারণ, তারা নিজেদের স্বামী ছাড়া অন্য কারও সন্তান গর্ভে ধারণ করতে চায় না!

জবাব শুনে ওই ইউরোপিয়ান কূটনীতিবিদ একেবারে লা-জবাব হয়ে গিয়েছিল! সম্ভবত একেই বলে- "যেমন কুকুর তেমন মুগুর"।[৬৫]

---

৬৫. আল আনিস ফিল ওয়াহদাহ-২৫৩, মুহাম্মাদ আদিব কালকাল।

Scanned by CamScanner

জাদুকরি চশমা আর হারানো ঘড়ি

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সময়ে ১৮৭৯ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত আল্লামা আহমদ ওয়াফিক পাশা ছিলেন খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ বুরসার গভর্নর। সে সময়কার একটি চমৎকার ঘটনা!

আহমদ ওয়াফিক পাশা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি আসরে বসে আছেন। ইত্যবসরে সেখানে তার কাছে এসে উপস্থিত হয় এক অশীতিপর বৃদ্ধা। সকলের সামনেই বৃদ্ধা এই বলে তার আরজি পেশ করে–'হে গভর্নর! আমি আমার ঘড়িটি হারিয়ে ফেলেছি! ঘড়িটি খুবই মূল্যবান। এটি আমি পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলাম। আমি শুনতে পেয়েছি, তুমি নাকি এমন একটা জাদুকরি চশমা পরে থাকো, যা দিয়ে সব হারানো বস্তু দেখতে পাও! অনুগ্রহ করে কি তোমার এই বুড়ি চাচির জন্য চশমাটা পরে একটু তালাশ করতে পারবে?'

আহমদ ওয়াফিক পাশা বললেন, 'ভালো কথা চাচি! আচ্ছা, আপনার ঘড়িটা কেমন ছিল?

বৃদ্ধা তার ঘড়ির সব গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। সব শুনে আহমদ ওয়াফিক পাশা বললেন, 'ঠিক আছে চাচি! আমি রাতে ওই জাদুকরি চশমাটা পরে আপনার ঘড়িটা তালাশ করব। আগামীকাল এসে ঘড়িটা নিয়ে যাবেন। ঠিক আছে?'

বৃদ্ধা মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে চলে গেল।

আহমদ ওয়াফিক পাশা উপস্থিত সকলকে লক্ষ করে বললেন, 'দেখুন! মহিলাটি যেমন বৃদ্ধা; তেমনি একেবারে নিঃস্ব, রিক্ত ও দরিদ্র। সে নিরুপায় হয়েই আমার এখানে এসেছে। অতঃপর তিনি একজনকে বৃদ্ধার বর্ণনাকৃত গুণাগুণ অনুসারে হুবহু একটি ঘড়ি খরিদ করে আনতে আদেশ দেন।

পরদিন বৃদ্ধা আবার আসলে আহমদ ওয়াফিক পাশা তাকে খরিদকৃত ঘড়িটা দিয়ে বললেন, 'চাচি! গতরাত আমি আমার জাদুকরি চশমাটা পরে আপনার হারানো মূল্যবান ঘড়িটা তালাশ করে পেয়েছি। তবে তালাশ করতে গিয়ে আমি আমার সেই জাদুকরি চশমাটা হারিয়ে ফেলেছি! তাই আপনার সব মূল্যবান জিনিস এখন থেকে খুব সযত্নে রাখতে হবে। আবার হারালে কিন্তু আর খুঁজে দিতে পারব না।[৬৬]

৬৬. আল ইমারাতুরিয়্যাতুল উসমানিয়্যাহ-অটোম্যান এম্পিয়ার (ফেইসবুক পেইজ)।

Scanned by CamScanner

সুলতান ও সম্রাজ্ঞীরা যখন সেবক

কোনো রণক্ষেত্র থেকে যখন প্লাটুনের পর প্লাটুন আহত সৈন্য ইস্তাম্বুলে আগমন করত, তখন সুলতান আবদুল হামিদ তাদেরকে রাজপ্রাসাদের প্রশস্ত আঙিনায় পাঠিয়ে দিতেন। সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলত। সুলতান প্রাসাদের খাদেমাসহ উসমানি সম্রাজ্ঞীদের পর্যন্ত যুদ্ধাহত সৈন্যদের ছেঁড়াফাঁড়া কাপড় সেলাই করার জন্য আদেশ করতেন। সময় পেলে তিনি নিজেও তাদের সাথে ভাঙ্গা হাড়গোড় জোড়া লাগানোর জন্য লাকড়ির খাটিয়া বানানোর কাজে শরিক হয়ে তা আহতদের কাছে পৌঁছে দিতেন। এছাড়া সময় সময় আহতদের খোঁজখবরও নিতেন। তাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করতেন।

কোনো যুদ্ধময়দান থেকে বিজয়ের সুসংবাদ আসলে সাথে সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন। এরপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন– আগামীতেও যেন তাদেরকে বিজয় দান করেন ও উম্মতে মুহাম্মাদির সাহায্য করেন।

তার অভ্যাস ছিল, তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েই গোসল করতেন। ফজরের সালাত আদায় করতেন। সালাত শেষ হতে না হতেই তার স্ত্রী কফির কাপ নিয়ে এসে হাজির! তিনি কফি পান করতেন। পান শেষ হয়ে গেলে কাপটা রেখে স্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে চুমু খেতেন আর বলতেন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।

এভাবে একদিন কফি পান করা অবস্থায় এই দুনিয়া ত্যাগ করেন। তার সর্বশেষ কথা ছিল 'ইয়া আল্লাহ'![৬৭]

---

৬৭. আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ (ফেসবুক পেইজ)

Scanned by CamScanner

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের বাস্তব প্রতিচ্ছবি

শাহজাদা 'আবিদ আফেন্দি' ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের কনিষ্ঠ ছেলে। জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৪ সালে। যখন সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করে নির্বাসন দেয়া হয়, সাথে শাহজাদা আবিদ আফেন্দিকে থাকার অনুমতি দেয়া হয়। কারণ, তখন শাহজাদার বয়স ছিল খুবই কম।

সিংহাসনচ্যুত সুলতান শাহজাদাকে আলাদাভাবে দেখাশোনা করতেন। অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাকে দীক্ষা দিতেন। পিতার সঠিক তত্ত্বাবধানেই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। সে হিসেবে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের ছেলেদের মধ্যে 'শাহজাদা আবিদ আফেন্দি'-ই পিতার গুণ ও স্বভাব সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে জোরপূর্বক পদচ্যুত করে প্রথমে তাকে গ্রিসের 'সালোনিক' শহরে নির্বাসন দেয়া হয়। পরে স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসা হয় ইস্তাম্বুলে। বাকি জীবন বসফরাস প্রণালীর কিনারে 'বেলেরবি' প্রাসাদেই অতিবাহিত করেন সুলতান। শাহজাদা আবিদ আফেন্দিও পিতার সাথে বাস করতেন।

শাহজাদা আবিদ আফেন্দি সামরিক স্কুলে লেখাপড়া করতেন। ইস্তাম্বুলের বসফরাস প্রণালীর ওপারে ছিল তার স্কুল। প্রতিদিন জাহাজে চড়ে স্কুলে আসা-যাওয়া করতে হতো। একদিন স্কুল থেকে আসার পথে হঠাৎ আসমান কালো করে বৃষ্টির ঘনঘটা দেখা দেয়। সাথে বইতে থাকে প্রবল বেগের বাতাস। শাহজাদা তখন স্কুলসাথীদের সাথে একটি জাহাজে ছিলেন। জাহাজ ছিল প্রণালীর মধ্যখানে। বাতাসের তোড়ে একদিকে ফুলে উঠছিল প্রণালীর জল। অপরদিকে দুলছিল জাহাজও। নাবিক কোনওভাবেই জাহাজটিকে বন্দরে ভিড়িয়ে নোঙর করতে পারছিল না। জাহাজ বারবার বালুচরে ধাক্কা খাচ্ছিল। অবস্থার ভয়াবহতা অনুভব করে জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসার জন্য জাহাজের হুইসেল বাজিয়ে দেন ক্যাপ্টেন।

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ প্রাসাদেই ছিলেন। জাহাজের ফরিয়াদি হুইসেল শুনেই তিনি সচকিত হয়ে উঠেন। তড়িৎ ছুটে আসেন দরজার কাছে। জাহাজের করুণ অবস্থা দেখে হতবিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হায় আল্লাহ! আমার ছেলে আবিদ যে এই জাহাজে'!

Scanned by CamScanner

হুইসেল শুনতেই সাথে সাথে ছুটে আসে বন্দরের নিরাপত্তারক্ষীদল। উদ্ধার শুরু করে জাহাজের যাত্রীদের। সর্বপ্রথম তারা শাহজাদা আবিদ আফেন্দিকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসে। কারণ, একে তো তিনি শাহজাদা, তদুপরি অল্পবয়সী কিশোর। তার বয়স তখনও দশে পৌঁছায়নি। কিন্তু শাহজাদা আবিদ আফেন্দি তা প্রত্যাখ্যান করে বসলেন। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন,

'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত নামব না, যতক্ষণ না জাহাজের সকল নারী ও শিশুরা নামবে!'

তারপরও উদ্ধারকর্মীরা তাকে নামাতে চাইলে তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। শেষ পর্যন্ত সকল যাত্রী নেমে আসার পরই তিনি নেমে আসেন।

শাহজাদা আবিদ আফেন্দি প্রাসাদে ফিরে দেখতে পেলেন পিতাসহ প্রাসাদের সবাই প্রধান ফটকের পাশে এসে তার আগমনের অপেক্ষা করছেন। শাহজাদা সবাইকে ঘটে যাওয়া কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে শোনালে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তার হাতে মুহাব্বাতের চুমো খেয়ে নেন।

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ পুত্রের এমন সহমর্মী মানসিকতা শুনে আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেন। ছেলেকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিয়ে বলেন, খুব ভালো কাজ করেছো বাবা! তোমাকে এমন হওয়াই চাই। তুমি আমার গর্বের ধন হে বীর![৬৮]

৬৮. ওয়ালিদি আস সুলতান আবদুল হামিদ, শাহজাদি আয়েশা উসমান উগলি।

Scanned by CamScanner

বিয়ে ও লাল-হলুদ ফুল সমাচার

উসমানি খেলাফতের যুগে প্রায় প্রতিটি ঘরের সামনে লাল ফুলের তোড়া দেখা যেত। লাল ফুলের তোড়া দেখা মানেই ওই ঘরে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে বলে বোঝে নেয়া হতো।

উসমানিরা তাদের ঘরে মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হয়ে গেলেই ঘরের সামনে লাল ফুলের তোড়া রাখত। কোনো ঘরের সামনে একটি, কোনো ঘরের সামনে দুটি আবার কোনো ঘরের সামনে তিন বা তারও চেয়ে বেশি লাল ফুলের তোড়া দৃষ্টিগোচর হতো। ফুলের তোড়ার সংখ্যাই ছিল ঘরের মেয়েদের সংখ্যার অনুপাত। তোড়ার সংখ্যা দেখেই অনুমান করে নিতে হতো ওই ঘরে কয়টা মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত।

ঘরের সামনে লাল ফুলের তোড়া রাখা মানেই ছিল রাস্তা দিয়ে অতিক্রমকারিনী মহিলাদেরকে ঘরের ভেতর এককাপ চা পান করার আমন্ত্রণ এবং মেয়েকে একনজর দেখে যাওয়ার আবেদন। ছেলের জন্য মেয়ে তালাশকারিনী কোনো মহিলা রাস্তা দিয়ে অতিক্রমকালে কোনো ঘরের সামনে লাল ফুলের তোড়া দেখতে পেলে সাথে এককাপ চা পান করার ফাঁকে ছেলের জন্য মেয়ে দেখার নিমিত্তে ঘরে ঢুকে যেতেন। এরপর মেয়ে পছন্দ হলে কদিন পর বিয়ের 'শানাই বাজিয়ে' মেয়েকে কনে সাজিয়ে পালকিতে তুলে নিয়ে যেতেন।

কনেপক্ষ পাত্র দেখার সময় খুব ভালোভাবে পাত্রের কপাল ও হাটুর দিকে লক্ষ করত। যাতে তার কপাল এবং হাটুতে সিজদাহর কালো দাগ থাকলে দেখা যায়। পাত্রের কপাল আর হাটুতে কালো দাগ থাকলে ছেলেকে নামাজি মনে করা হতো। মেয়েটাকে ছেলেটার কাছে পাত্রস্থ করা যায়। আর কপাল ও হাঁটুতে কালো দাগ প্রতীয়মান না হলে পাত্রকে বেনামাজি জ্ঞানে বিয়ের প্রস্থাব নাকচ করে দেয়া হতো। মনে করা হতো, এর কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া যায় না!

বিয়ের আগের রাতে কনের দাদি, নানি, চাচি, ফুফু, ভাবি, সখি আর পাড়ার মেয়েরা কনেকে মেহেদি পরানোর জন্য ঘিরে বসত। এ রাতকে বলা হতো 'মেহেদি রাত'। একসাথে সবাই মিলে মন খুলে গীত গাইত। এ গীত আনন্দের নয়; বিরহের। কনে সম্মিলিত কণ্ঠের সুরেলা বিরহী গীত শুনতো আর কেঁদে বুক ভাসাত। অঝোর ধারায় উপস্থিত সকলেও কেঁদে আগাম বিরহের বহিঃপ্রকাশ করে চলত। এজন্য এ রাতকে 'অশ্রুঝরার রাত'-ও বলা হতো। সর্বপ্রথম কনের মা একটি স্বর্ণমুদ্রার উপর কিছুটা মেহেদি নিয়ে মেয়ের

Scanned by CamScanner

হাতের তালুতে গোল বৃত্তাকারে পরিয়ে দিতেন। অতঃপর অন্যান্যরা হাতের সব আঙুলের অগ্রভাগে মেহেদি ভরিয়ে দিত।

বিয়ের পর ভালোবাসার ডালি বিলাতে স্বামী নবপরিণীতাকে নিয়ে উঠত ধরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে। উপরে উঠার সময় স্বামী থাকত পেছনে আর স্ত্রী আগে আগে। যাতে পা পিছলে পড়তে গেলে খপ করে ধরে নিতে পারে স্বামী! আর নামার বেলায় আগে নামত স্বামী, যাতে স্ত্রী আগের দিকে ঝুঁকে পড়তে গেলে স্বামী সামলে নিতে পারে! স্ত্রীও নির্ভয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠত বা নামত এই ভরসায় যে, প্রাণপ্রিয় পতি আছে তার পাশে!

কোনো ঘরে কেউ অসুস্থ হলে ঘরের দরোজার উপর হলুদ ফুলের তোড়া রাখা হতো। যাতে দরজার সামন দিয়ে অতিক্রমকারী গাড়ি, পণ্যবিক্রেতা বা পথিক বুঝতে পারে, ঘরে রেগী আছে; জোরে কোনো শব্দ যাবে না।

প্রতিটি ঘরের দরোজায় থাকত করে দুটি কড়া। একটি ছোট আরেকটি বড়। ছোট কড়াটি নাড়ানো হলে বোঝা যেত আগন্তুক একজন মহিলা। তখন গৃহকর্ত্রী এসে দরজা খুলে দিতেন। আর বড় কড়াটি নড়ে উঠলে মনে করা হতো, আগন্তুক একজন পুরুষ। তখন গৃহকর্তা এসে দরজা খুলে দিতেন।

ছোটরা বড়দের সীমাহীন পর্যায়ের সম্মান করত। রাস্তায় হাঁটার সময় ছোটরা কখনও বড়দের আগে আগে যেত না। এমনকি তাড়া থাকলেও আগে যাওয়ার চেষ্টা করত না। অন্য কোনো পথ অবলম্বন করত। যাতে কেউ এ কথা না বলে—অমুকের ছেলেটি তো দেখি সাংঘাতিক বেয়াদব!

ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু ইত্যাকার শ্রেণিবৈষম্য ব্যতিরেকে উসমানিরা বিভিন্ন উৎসব ও দিবস উপলক্ষ্যে একে অপরের বাড়িতে বেড়াতে যেত। সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত পেশ করত।

প্রায় সকল পুরুষই পাগড়ি পরিধান করত। পাগড়ি ছিল উসমানি খেলাফতের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। ছোট বড় সকলেই পাগড়ি পরত। তবে সকলের পাগড়ির ধরন সমান ছিল না। মাথার পরিহিত পাগড়ি-ই বলে দিত যে, লোকটা কোন শ্রেণি বা পেশার অন্তর্ভুক্ত।[৬৯]

---

৬৯. তুর্কপ্রেস ডটকম। *আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ (ফেইসবুক পেইজ)।

Scanned by CamScanner

পাথর বা দেয়ালের খাঁজে সদকাহর টাকা

উসমানি খেলাফতের যুগে রাস্তার আশেপাশে, বাজারে ও জনসমাগমস্থলে পাওয়া যেত বালু আর পাথরের তৈরি কিছু পাথর। এগুলোকে সদকাহর পাথর বলা হতো। দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের রাস্তার পার্শ্বস্থ ডাকবাক্সের মতো। তেমনিভাবে মসজিদ ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে সদকাহ-খয়রাতের টাকা-পয়সা রাখার জন্য খোদাই করে বানানো হতো কিছু খাঁজ।

ডাকবাক্সে যেভাবে লোকেরা চিঠিপত্র রেখে দেয়, সেভাবে উসমানিরাও এসব পাথর বা দেয়ালের খাঁজে দানের টাকা-পয়সা রাখত, যাতে দরিদ্র ব্যক্তিরা সেখান থেকে অনায়াসে তা নিয়ে যেতে পারে! দরিদ্র ব্যক্তিরাও সেসব পাথর বা খাঁজ থেকে সকলের অগোচরে নিজের প্রয়োজনুসারে টাকা-পয়সা নিয়ে নিত।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, অনেকসময় সেই টাকা পাথরের গর্ত বা দেয়ালের খাঁজের মধ্যে অনেকদিন পড়ে থাকত। নেয়ার মতো কেউ আসত না!

সদকাহর এসব পাথর বা দেয়ালের খাঁজে কেউ হাত ঢুকালে বোঝার কোনো উপায় থাকত না যে, ভেতরে প্রবিষ্ট এই হাত দান-খয়রাত দাতার নাকি গ্রহীতার!

অনেক সময় উসমানিরা সদকাহর পাথরে দানের টাকা-পয়সা না রেখে রাস্তার ওপর মাটিতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে চলে যেত![৭০]

৭০. তুর্কপ্রেস ডটকম। *ইসলামস্টোরি ডটকম।

Scanned by CamScanner

গোলাপজল দিয়ে রেলপথকে ধৌত করা

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের খেলাফতকাল। অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শত্রুতার ফলে উসমানি খেলাফতের অবস্থা নড়বড়ে। চরম হুমকির মুখে এককালের ইউরোপ কাঁপানো শক্তি। একসময় যে সালতানাতের নাম শুনে থরথর করে কাঁপত যে ইউরোপ, আজ তারাই সে সালতানাতকে 'অসুস্থ পুরুষ' বলে কটাক্ষ করছে! ছয় শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী এ সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখতে হলে উন্নয়নমূলক কাজে হাত দিতে হবে। বিশেষ করে যোগাযোগব্যবস্থায়। কারণ, আরবের বিভন্ন দেশ থেকে হজ্জের উদ্দেশে বাইতুল্লাহর মুসাফিরদের যাতায়াতব্যবস্থা সীমাহীন কষ্টকর। আরবের ধুধু মরু-বিয়ানবানগুলো পাড়ি দিতে হাজিদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে আসে। অনেকে মারাও যায়।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ আরব ভূখণ্ডজুড়ে রেলপথ স্থাপনের উদ্যোগ নেন। একদল অভিজ্ঞ জার্মান ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা সুলতান কাজ শুরু করে দেন। ১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বরে দামেশক পর্যন্ত তৈরি হয় রেললাইন। আর ১৯০৮ সালের ৩১ আগস্ট রেললাইনের কার্যক্রম পৌঁছে যায় মক্কা-মদিনা পর্যন্ত। রেললাইনের কার্যক্রম মদিনা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে এসে থামলে সুলতান এই ত্রিশ মাইল জুড়ে রেললাইনের পাতকে মোটা সুতোর গাঢ় কাপড়ের গিলাফ দ্বারা বেষ্টন করার এবং এই ত্রিশ মাইল পর্যন্ত রেলগাড়ির গতি কমিয়ে দেয়ার আদেশ জারি করেন। যাতে পাতের সাথে রেলের লোহার চাকার ঘর্ষণসৃষ্ট বিকট আওয়াজে মদিনার মাটিতে শায়িত মায়ার নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মদিনাবাসীর কষ্ট না হয়! শুধু তাই নয়; ত্রিশ মাইল বিস্তৃত এই গিলাফকে দৈনিক এক নির্দিষ্ট সময়ে গোলাপজল দিয়ে ধৌত করারও ফরমান জারি করেন।

সুলতানের হুকুমে রেললাইন গিলাফবদ্ধ করা হয়। দৈনিক একবার করে ধৌত করা হতে থাকে গোলাপজল দিয়ে। ত্রিশ মাইলে এসে রেলগাড়ির গতি শ্লথ হয়ে যেত। ফলে ইসরাফিলের শিঙ্গার মতো কান বিদীর্ণকারী আর কোনো বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠে না পবিত্রভূমি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আরবের এই রেলপথ ধ্বংস হয়ে যায়। আজও এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও রেললাইনের ভগ্ন টুকরা দৃষ্টিগোচর হয়।[৭১]

---

৭১. তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ (ফেইসবুক পেইজ)।

Scanned by CamScanner

এগার বছর বয়সেই বোরখা পরার হুকুম

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের কন্যা শাহজাদি আয়েশা উসমান উগলি তার ডায়রিতে লিখেন, 'আমার বয়স যখন এগারো আমি তখন বয়সের তুলনায় একটু বেশিই বেড়ে গিয়েছিলাম। একটু বেশিই লম্বা হয়ে গিয়েছিলাম। যে কেউ আমাকে দেখলে আমার বয়সের ব্যাপারে ভ্রমে পড়ে যেত।

এক শুক্রবারে আমি জুম্মার শোভাযাত্রায় (উসমানি সুলতানগণ তোপকাপি রাজপ্রাসাদ থেকে জুমআর নামাজ আদায়ের জন্য বের হলে দেহরক্ষী, সেনা, রাজদরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও জনসাধারণ আড়ম্বরপূর্ণভাবে সুলতানদের শোভাযাত্রার মাধ্যমে মসজিদে নিয়ে যেতেন ও জুম্মা শেষে নিয়ে আসতেন) শরিক হওয়ার জন্য রাজপ্রসাদ থেকে বের হই। এটি ছিল আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। সেদিন আমি বিভিন্ন রঙের একটি পোষাক পরেছিলাম। জুমআর নামাজের পর আব্বাজান স্বাভাবিক অভ্যাসের বিপরীত মসজিদের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে হেরেমের টাংগার দিকে চেয়ে থাকেন। সাধারণত তিনি জুমআর নামাজ শেষ করে সরাসরি রাজকীয় টাংগায় এসে গাড়োয়ানকে[৭২] টাংগা চালাতে বলতেন। আব্বাজানের চাহনি দেখে আমি টাঙার[৭৩] জানালা দিয়ে মাথা বের করে হাসছিলাম।'

বিকেলে খাবার দস্তরখানে বসে আব্বাজান আম্মাজানকে বললেন, 'আজকে আমার মেয়েকে টাংগার ভেতর দেখতে পাই। দূর থেকে তাকে বয়সের তুলনায় বড় দেখাচ্ছিল। যে চিনবে না, সে তাকে যুবতী মনে করবে। সে হিসেবে এখন থেকেই তাকে নিকাবসহ বোরখা পরতে হবে। আর কখনও সে মুখ খুলে বাইরে বেরুতে পারবে না।'

কিন্তু আম্মাজান আপত্তি উত্থাপন করে বললেন, 'কিন্তু এমনটা হবে কেন? ওর বয়স তো অনেক কম?'

আব্বাজান বললেন, 'তুমি কি মনে করো যে, লোকেরা কখনও বলবে না আমি আমার মেয়েকে মুখ খুলে বেপর্দা ছেড়ে দিয়েছি? সে কি কোনো একদিন বোরখা পরবে না? যেহেতু তাকে একদিন বোরখা পরতেই হবে, সেহেতু আজ থেকেই সে বোরখা পরতে শুরু করুক।[৭৪]

---

৭২. গরু বা গোড়ার গাড়ি চালক।
৭৩. গরু বা গোড়ার গাড়ি।
৭৪. ওয়ালিদি আস সুলতান আবদুল হামিদ আস সানি-১১৩, শাহজাদি আয়েশা উসমান উগলি।

Scanned by CamScanner

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের হুমকি

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের শাসনকাল। ঘরে-বাইরে শত্রু। অভ্যন্তরীণ আর বহিরাগত চক্রান্তে উসমানি খেলাফত অনেকটা দুর্বল। অনেকটা নেতিয়ে পড়েছে এককালের ক্ষমতাধর পরাশক্তি। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ক্ষমতা আরোহণ করছেন বেশিদিন হয়নি। খেলাফতের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাকে। অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতির মোকাবেলা করে চলছেন সুলতান। এমনই এক সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে খবর আসলো, ফরাসি একাডেমির সদস্য কুলাঙ্গার 'মার্ক ডি ব্রুনাই' মুসলমানদের কলিজার টুকরো হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে অবমাননাকর নাটক তৈরি করেছে। এরপর শুধু ফ্রান্স নয়; গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে এই নাটকের আলোচনা। ইউরোপবাসী যেন মুখিয়ে আছে এই নাটকটি উপভোগ করার জন্য।

খবরটি শোনামাত্র ক্ষুধার্ত শার্দুলের মতো গর্জে উঠলেন সুলতান। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'বনু উসমানের শাসন নরকে যাক; যদি আমি এই নাপাক নাটকটা বন্ধ করতে না পারি'!

এরপরই সুলতান ফ্রান্সে অবস্থানরত উসমানি দূত সালিহ মুনিরের মাধ্যমে ফ্রান্স সরকার প্রধান 'সাডি কার্নে'-কে কড়া হুশিয়ারি উচ্চারণ করে একটি অগ্নিঝরা চিঠি প্রেরণ করেন। চিঠির ভাষা ছিল খুবই উত্তেজক! লোমহর্ষক! ভয়ানক! এখানেই শেষ নয়; উসমানি সেনাবাহিনীকে ইউনিফর্ম পরে যুদ্ধের দামামা বাজানোর নির্দেশ দিয়ে দেন সুলতান। নিজেও যুদ্ধের পোশাক পরে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে খেলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুলে অবস্থানরত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত 'কাউন্ট মুম্বেলা'-কে তলব করেন। ফরাসি রাষ্ট্রদূত মনে করেছিল, নিশ্চয় সুলতান সিনেমার প্রসঙ্গে কথা বলার জন্য তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। হয়তো তিনি তার হাতে একটি প্রতিবাদমূলক চিঠি দিয়ে ফ্রান্স সরকারের কাছে পাঠানোর আদেশ করবেন। কিন্তু না, ইস্তাম্বুলের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতেই রাষ্ট্রদূতের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়! যুদ্ধের ইউনিফর্ম পরিহিত সেনাদের দেখামাত্রই সে ভড়কে উঠে! এরপর যখন দেখতে পায়, স্বয়ং সুলতানই যুদ্ধের পোশাক পরে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে আছেন, তখন তো তার মূর্ছা যাওয়ার পালা! সুলতান অগ্নিমূর্তি ধারণ করে নাটকের ব্যাপারে তাকে শাসিয়ে বললেন,

Scanned by CamScanner

'তোমার সরকারকে বলো—যদি নাটকটি সম্প্রচার করা হয়, তাহলে ফ্রান্সের সাথে উসমানি খেলাফতের সবধরনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা হবে। ফরাসি রাষ্ট্রদূত সুলতানের কথা মাথা পেতে মেনে নিয়ে কুর্নিশ করে কোনোরকম খেলাফতের দরবার ত্যাগ করে হাফ ছেড়ে বাঁচে।'

খেলাফতের দরবার থেকে বেরিয়েই সে প্যারিসের উদ্দেশে যে চিঠি লিখেছিল তার সারমর্ম ছিল, "নাটকটির কারণে উসমানীয়রা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। শীঘ্রই নাটকটি বন্ধ করে দেয়া হোক।"

চিঠি পৌঁছার সাথে সাথে ফ্রান্স সরকার সিনেমাটি বন্ধ করে দিয়েছিল।

কিন্তু নাটক নির্মাতা নিজ ইচ্ছার উপর অটল ছিল। সে ফ্রান্সের বাইরে সম্প্রচারের উদ্দেশে ইংল্যান্ড সরকারের কাছে নাটকটি সম্প্রচার করার অনুমতি তলব করে। তার আশা ছিল সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের হাত এতোদূর পর্যন্ত পৌঁছবে না। কিন্তু তার সে আশায় গুড়েবালি পড়ল। সুলতান ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'লর্ড স্যালসবুরি'র মাধ্যমে নাটকটি সেখানেও সম্প্রচারিত হওয়া থেকে বাধা দিলেন। এমনকি গোটা ইউরোপে নাটকটি সম্প্রচার না হওয়ার একটি আইন প্রয়োগ করিয়ে ছাড়লেন।

কিন্তু এরপরও নাটক নির্মাতা আশাভঙ্গ করেনি; সে ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'লর্ড স্যালসবুরি'র পরবর্তী পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'রুজরেব্রি'র মাধ্যমে নাটকটি সম্প্রচার করার দুরভিসন্ধি আঁটে। নতুন এ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল কট্টর ইসলামবিদ্বেষী। সে লন্ডনের কোনো এক সিনেমা পরিচালকের সাথে চুক্তিও সেরে নিয়েছিল। কিন্তু এখানেও বাঁধ সাধলেন সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ! অবশেষে এই নাটকটি প্যারিসেই নাম ও মূল বিষয়বস্তু পাল্টিয়ে সম্প্রচারিত হয়।[৭৫]

---

৭৫. তুর্কপ্রেস ডটকম (অনলাইন আরবি নিউজ পোর্টাল)।

Scanned by CamScanner

উসমানিদের বিবাহ আইন

যুবসমাজের চারিত্রিক স্খলন আর নৈতিক অবক্ষয় রোধের একমাত্র মহৌষধ বিয়ের ব্যাপারে উসমানি খেলাফতের ছিল বিবেকসম্মত কতগুলো চমৎকার আইন! আইনগুলো পড়ে চিন্তা করে দেখুন, বর্তমান সময়ে এই আইনগুলো বলবৎ থাকলে আমাদের সমাজে কি অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা, পরকীয়া, নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, ইভটিজিং ইত্যাদি জন্ম নিত? যুবতীরা কি আইবুড়োত্বের অভিশাপ নিয়ে মানবেতর জীবনাতিপাত করত? বিয়ের বাজারে মন্দা দেখা দিত? পতিতাবৃত্তি রমরমা শিল্প হয়ে উঠত?

এক. ঐচ্ছিক বিয়ের বয়স শুরু হতো আঠার বছর থেকে। শেষ হতো পঁচিশে। এর মধ্যে বিয়ে না করলে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হতো।

দুই. কেউ অসুস্থতার অজুহাত দেখালে তদন্ত করে দেখা হতো তা সঠিক কি না। রোগটা নিরাময়যোগ্য হলে সুস্থ্য হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় চাপ স্থগিত রাখা হতো। আর দুরারোগ্য ব্যাধি হলে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই বিয়ে করতে বাঁধা দেয়া হতো।

তিন. পঁচিশ বছর হয়ে যাওয়ার পরও কেউ বিনা কারণে বিয়ে না করলে তার আয়/ব্যবসা বা সম্পদের এক চতুর্থাংশ কেটে রাখা হতো। জব্দকৃত অর্থ নিয়ে বিবাহে ইচ্ছুক গরিবদের বিয়ের বন্দোবস্ত করা হতো।

চার. পঁচিশ বছরের পরও বিয়ে না করলে রাষ্ট্রীয় কোনো চাকরিতে নেয়া হতো না। কোনো সংগঠনেও যোগদান করতে দেয়া হতো না। আর চাকরিতে থাকলে বহিষ্কার করা হতো।

পাঁচ. বয়স যদি পঞ্চাশ বছর হয়ে যায়, ঘরে স্ত্রী থাকে একটা; আর্থিক সঙ্গতিও ভালো, এমতাবস্থায় তাকে সামাজিক কোনো কাজে অর্থ দিয়ে অংশগ্রহণ করতে বলা হতো। গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ দেখিয়ে অপারগতা প্রকাশ করলে, সামর্থ্য অনুসারে অন্তত এক থেকে তিনজন এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে বাধ্য করা হতো।

ছয়. আঠার থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে যদি কোনো গরিব যুবা বিয়ে করত, তাকে হুকুমতের পক্ষ থেকে ১৫৯ থেকে শুরু করে ৩০০ 'দুনমা' পরিমাণের জমির বন্দোবস্তি দেয়া হতো। চেষ্টা করা হতো জমিটা যেন তার বাড়ির কাছাকাছি হয়।

Scanned by CamScanner

সাত. গরিব বর কারিগর বা ব্যবসায়ী হলে তাকে কোনো বিনিময় ছাড়াই তিন বছর মেয়াদে পুঁজি দেয়া হতো।

আট. ছেলে বিয়ে করার পর বাবা-মায়ের সেবা করার জন্যে আর কোনও ভাই না থাকলে বরকে বাধ্যতামূলক সেনাকার্যক্রম থেকে রেহাই দেয়া হতো। মেয়ের বিয়ের পর যদি বাবা-মায়ের সেবার জন্যে ঘরে কেউ না থাকত তাহলে মেয়ের জামাইকেও বাধ্যতামূলক সেনাকার্যক্রম থেকে রেহাই দেয়া হতো।

নয়. পঁচিশ বছরের আগেই বিয়ে করে তিনসন্তানের বাবা হলে নৈশস্কুলে বিনামূল্যে তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেয়া হতো। সন্তান তিনজনের বেশি হলে তিনজনের লেখাপড়ার ব্যবস্থা বিনামূল্যে করা হতো। বাকী সন্তানদের জন্যে দশ টাকা করে বরাদ্দ করা হতো তেরো বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত।

কোনো মহিলার ঘরে চার বা তার চেয়ে বেশি ছেলে সন্তান থাকলে তাকে মাথাপিছু বিশ টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হতো।

দশ. কোনো ছাত্র লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত থাকলে লেখাপড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত বিয়ে স্থগিত রাখার অনুমতি দেয়া হতো।

এগার. কোনো কারণে স্বামীক অন্য এলাকায় থাকতে হলে স্ত্রীকেও সাথে করে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হতো। কোনো কারণে স্ত্রীকে সাথে নিতে না পারলে, স্বামীর যদি আরেক বিয়ে করার সামর্থ থাকে, তাকে কর্মস্থলে আরেক বিয়ে করতে বাধ্য করা হতো। তারপর চাকরি শেষে নিজের এলাকায় ফিরলে দুই স্ত্রীকেই সমান অধিকারে রাখতে বাধ্য করা হতো।[৭৬]

---

৭৬. আরশেফুত তারিখিল উসমানি, অটোম্যান হিস্টোরি আরকাইভ (ফেইসবুক পেইজ)।

Scanned by CamScanner

রাসুলের মদিনায় আগে বাল্ব জ্বলবে

মুসলিম বিশ্বে যখন প্রথম বিদ্যুৎ আসে, তখন উসমানি খেলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুলের মসনদে ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ। আল্লাহর রাসুল ও পবিত্র হারামাইনের প্রতি তার ভালোবাসার ব্যাপারে ইতিহাস সাক্ষী। শুধু সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদই নন; বরং মক্কা মদিনার সাথে প্রত্যেক উসমানি সুলতানের ছিল অন্য রকমের ভালোবাসা।

রাষ্ট্রের সভাসদরা সুলতানের প্রাসাদে বিদ্যুৎ লাগানোর জন্য তোড়জোড় শুরু করলে সুলতান তাদের থামিয়ে দিয়ে বলেন,
'রাসুলের মদিনায় বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলার পূর্বে আমার প্রাসাদে জ্বলবে, এটা কখনও হতে পারে না!'
এরপর তার নির্দেশেই ১৯০২ সালে মসজিদে নববিতে প্রথম একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো হয়।

সুলতানের রাসুলপ্রেমের নিদর্শন হিসেবে আজও এই বাল্বটি শত বছরেরও বেশি সময় ধরে অক্ষত আছে। এই বাল্বটির গায়ে একটি কাগজ সাঁটা আছে। সেই কাগজে লেখা আছে, "বিসমিল্লাহ। এটা প্রথম ল্যাম্প, যা মসজিদে নববিতে স্থাপন করা হয়েছে ১৩২৫ হিজরি সনে। এবং এই তারিখই আরব উপদ্বীপে বৈদ্যুতিক বাল্ব প্রবেশের দিন।"[৭৭]

---

৭৭. তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ (ফেইসবুক পেইজ)।

Scanned by CamScanner

যেমন নাকি খেয়ে নিয়েছি মসজিদ

'যেমন নাকি খেয়ে নিয়েছি মসজিদ'! অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন, এ আবার কোনো নাম হল? অবাক হওয়ার কিছু নেই। বাস্তবেই এটি একটি মসজিদের নাম। পৃথিবীর ইতিহাসে মসজিদের সবচেয়ে আনকমন নাম। তুরস্কের ইস্তাম্বুলের ফাতিহ নামক এলাকার একটি ছোট্ট জামে মসজিদের নাম। তুর্কি ভাষায় মসজিদটির নাম 'সানকি য়াদম'। অর্থ: 'যেমন নাকি খেয়ে নিয়েছি'। এই অদ্ভুত নামের পেছনে রয়েছে একটি চমকপ্রদ কাহিনী।

ইস্তাম্বুলের ফাতিহ এলাকায় খাইরুদ্দিন আফেন্দি নামে এক দরিদ্র, মুত্তাকি ব্যক্তি ছিল। সে ফল, গোশত, মিষ্টি ইত্যাদি খরিদ করার জন্য বাজারে গেলে মনে মনে নিজের এই আগ্রহকে সামলে নিত 'সানকি য়াদম' বা 'যেমন নাকি খেয়ে নিয়েছি'। অতঃপর পকেটের টাকা পকেটে নিয়েই বাড়ি ফিরত! টাকাগুলো একটি সিন্দুকে সঞ্চিত করে রাখত। এভাবে তার মনের খুশিমত ফল, গোশত, মিষ্টি ইত্যাদি আর খাওয়া হতো না; বরং 'সানকি য়াদম' বলে মনে মনে খেয়ে সিন্দুকে রেখে দিত!

দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন। সপ্তাহ গড়িয়ে বছর, বছর পেরিয়ে যুগ। সময়ের সাথে টাকার পরিমাণ বাড়তে থাকে সিন্দুকে। এভাবে একদিন দেখা যায়, বেশ কিছু টাকা সঞ্চিত হয়ে গেছে। ওই দরিদ্র-মুত্তাকি ব্যক্তি সঞ্চিত টাকা দিয়ে নিজ মহল্লায় একটি ছোট্ট মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে নেয়। অতঃপর যখন মহল্লাবাসী মসজিদ নির্মাণের কাহিনী জানতে পারে, তারা মসজিদটির নাম রাখে 'সানকি য়াদম মসজিদ' বা 'যেমন নাকি খেয়ে নিয়েছি মসজিদ'![৭৮]

সমাপ্ত

৭৮. রাওয়াইয়ু মিনাত তারিখিল উসমানি-১০০, উরখান মুহাম্মাদ আলি।

Scanned by CamScanner

তাতারিদের হাতে সালজুকি সাম্রাজ্যের পতন হলে উসমান বিন আরতুগাল ১২৯৯ সালে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা করেন উসমানি সাম্রাজ্য।

আনাতোলিয়ার একসময়ের এই ছোট্ট জায়গিরটি পুরো এশিয়া মাইনর, পশ্চিম এশিয়া, পূর্ব প্রাচ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা আর উত্তর-পূর্ব ইউরোপে মোট উনত্রিশটি প্রদেশ নিয়ে প্রায় ৫২ লক্ষ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত ছিল। যে সীমানায় পৃথিবীর বর্তমান মানচিত্রে প্রায় ৪২ টি দেশের অবস্থান।

কিন্তু আফসোসের বিষয়, ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ ইসলাম বিদ্বেষী পশ্চিমাদের ক্রীড়নক মুস্তফা কামাল পাশা এ খেলাফতের কবর রচনা করেন।

উসমানি খেলাফত ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদী-সবচেয়ে বৃহৎ, সামরিক শক্তিধর ও সর্বশেষ ইসলামি খেলাফত। দুর্দান্ত ও মহাপ্রতাপধর এ সাম্রাজ্যের ভয়ে তৎকালীন অপরাপর সাম্রাজ্যগুলো কাঁপত থরথর করে! স্বয়ং আমেরিকা ও রাশিয়া উসমানি খেলাফতকে কর প্রদান করত! বেশি দূরের নয়—এ ইতিহাস মাত্র একশ বছর আগের!

আমরা এই খেলাফতের বিভিন্ন যুদ্ধকাহিনী জানতে পারলেও খেলাফতের সোনাফলা মাটি-প্রকৃতি, সোনালি দিন-রাত আর সোনার সেই রাজা-প্রজাদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না বললেই চলে!

উসমানি খেলাফতের সুদীর্ঘ ছয় শতাধিক বছরের যুগ-যুগান্তর ও কাল-কালান্তরের বাঁকেবাঁকে ঘটে যাওয়া ঈমান জাগানিয়া ও হৃদয়ছোঁয়া স্বপ্নিল কাহিনী, বর্ণিল গল্প ও স্বর্ণালি ইতিহাসের এক অতুলনীয় সমাহার এই 'উসমানি খেলাফতের স্বর্ণকণিকা' গ্রন্থটি। যে গ্রন্থটি ঐশী বিধানে পরিচালিত একটি সাম্রাজ্য, একটি জাতি ও একটি বিশাল সমাজের কতগুলো সোনার মানুষের সোনালি অবস্থা-ব্যবস্থাকে ফুটিয়ে তুলেছে। হেথা-হোথা ছড়ানো-ছিটানো বিক্ষিপ্ত কাহিনী, গল্প ও ইতিহাস-টুকরোকে বইটি একই সুতোয় গেঁথে নিয়ে এসেছে। সেই হিসেবে বইটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে আগাগোড়া উসমানি খেলাফতের ইতিহাসের কোন বই নয়; বরং উসমানি খেলাফতের বাস্তব সত্য কিছু ঈমানদীপ্ত, চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয় কাহিনীর অনবদ্য সঙ্কলন।

Kalantor Prokashoni

ISBN: 978 984 90473 3 9

Usmani Khelafoter Sornokonika
by Ainul Haque Qasimi
Kalantor Prokashoni
Cover : Enam Bin Siddik
Price BD ৳ 280, US $ 11.99, UK £ 8.99
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.kalantorprokashoni.com
facebook.com/kalantorprokashoni

রকমারি
rokomari.com/kalantorprokasoni

Scanned by CamScanner